উনিশ শ পাঁচ

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রকাশক :
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ
মূল্য—আড়াই টাকা

৪৬।১, বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা কালী-গঙ্গা প্রেস হইতে
কে, কে, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

আজকের বাংলার তরুণ-তরুণীদের হাতে

গতযুগের বাংলার তরুণ-তরুণীদের

এই অমর-কাহিনী তুলে দিলাম,

সেদিনকার আশা যেন

আজকের জীবনে

সফল হয়।

গ্রন্থকার

উনিশ শ পাঁচ

একটি যুগের কাহিনী

বাস্তবিকা

[ইংরাজীতে যাকে বলে documentary বলে, আমি তার নাম দিয়েছি বাস্তবিকা। অর্থাৎ এই কাহিনীতে যা কিছু বলা হয়েছে বা যা কিছু ঘটেছে, সবই বাস্তবিক ঘটনা, একদা এই জাতির জীবনে তা সংঘটিত হয়েছিল, কোনটাই লেখকের কল্পনা-প্রসূত নয়।

বাংলার এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ইতিহাসে উনিশ শ' পাঁচ শাল হলো তার জন্মবেদিকা। এই অবিস্মরণীয় লগ্নে বাঙালীর মধ্যে তার সাহিত্যে, সমাজে, ধর্ম্মে, রাজনীতিতে যে নতুন জোয়ার আসে, তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আজ আমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভ করেছি। এই সময় বাঙালীর মন ভেতর থেকে যেভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে মানব-ইতিহাসের তা এক সুন্দরতম অধ্যায়। আমাদের জাতির, আমাদের সভ্যতার, আমাদের সাহিত্য ও সমাজের প্রাণকেন্দ্র উনিশ শ' পাঁচের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। তাই প্রত্যেক বাঙালীর কাছে এই সময়কার জীবন ও ইতিহাস তার জাতীয় চেতনার পক্ষে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়। কারণ আমাদের জাতীয় চেতনার মূল শেকড় সেইখানেই আছে।

একান্ত দুঃখের বিষয়, মাত্র চল্লিশ বৎসর আগেকার ঘটনা, তাও আজ আমাদের কাছে বিলুপ্ত-স্মৃতি হয়ে আসছে। আজকের যাঁরা তরুণ, তাঁরা সেদিনকার বাংলাকে বিশেষ চেনেন না, জানেন না। এবং সেদিনকার বাংলাকে না চিনলে, না জানলে, না বুঝলে, বাঙালীকে বোঝবার অন্য পথ আর নেই। যে তরুণ তার নিজের জাতির মনকে চেনেনা, তার চেয়ে হতভাগ্য, তার চেয়ে অশিক্ষিত লোক পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তার সমস্ত শিক্ষা একটা বিরাট মানসিক আত্ম-প্রবঞ্চনার নাম মাত্র।

জাতির সেই মর্ম্ম-কেন্দ্রের সঙ্গে আজকের মনকে সংযুক্ত করবার জন্যেই এই বাস্তবিকার আঙ্গিক গ্রহণ করেছি। অবশ্য সেদিন যে বিরাট অভ্যুদয় হয়েছিল, তার সামগ্রিক পরিচয় এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে দেওয়া সম্ভব নয়···ইচ্ছা থাকলেও, অনেক ঘটনার স্মৃতি ইতি-মধ্যেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছে···বহু ঘটনা সরকারী গোপন দলিল-পত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে, সাধারণের আয়ত্তের বাইরে। সেইজন্যে এখানে শুধু চেষ্টা করেছি, সেই সব বিভিন্ন ঘটনার অন্তর্নিহিত মূল সুরটাকে যথাসম্ভব অবিকৃত রূপ দিতে, সেই চরম অভ্যুদয়ের অন্তরের স্পন্দনটাকে যতটা সম্ভব ভাষায় ধরতে। বর্ত্তমান যুগে যাঁরা প্রকৃত সাহিত্যিক হয়ে আসছেন, যাঁরা হবেন আজকের নতুন চেতনার ঐতিহাসিক, তাঁদের এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। জাতির অন্তরের এই দিব্য প্রকাশকে অবিকৃতভাবে তাঁদের সাধনায় তাঁরা রূপ দেবেন। তারই শুধু সূত্রপাত আজ এখানে করে গেলাম। জাতির অন্তরকে এইভাবে বাঁচিয়ে রাখা হলো, আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রেরও অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। যখন আমরা পরাধীন ছিলাম, তখন বহু সন্ধ্যা, বহু রাত্রি, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ভেবেছি, কবে সেদিন আসবে, যেদিন বাঙালী বলিষ্ঠ সত্যের সঙ্গে তার জাতির মর্ম্ম-কাহিনীকে রূপ দিতে পারবে। আমাদের সাহিত্যিক চেতনার গুরু

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রত্যেক অক্ষরের মধ্য দিয়ে এই নিদারুণ অভাবের কথা, নিদারুণ মানসিক দৈন্যের কথাই বলে গিয়েছেন। আজকে সেই অভাব পরিপূরণ করবার লগ্ন এসেছে। আজ এসেছে সেই সুসময় যখন কমলাকান্তের অন্তরের বাসনা চরিতার্থ হতে পারে।

এই জাতীয় ব্রত উদ্‌যাপনে যেমন প্রয়োজন সাহিত্য-সাধকের, তেমনি প্রয়োজন আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রের সত্য-উদ্বুদ্ধ নব-শক্তির সহায়তা। আমাদের আশা, আমাদের রাষ্ট্রের কাছ থেকে সে-সাহায্য আমরা নিশ্চয়ই পাবো।

আজ প্রচারের বহু বৈজ্ঞানিক উপায় আমাদের আয়ত্ত হয়েছে। তার মধ্যে লোকশিক্ষার জন্যে সব চেয়ে উপযোগী হলো ছায়াচিত্র, বিশেষতঃ আমাদের মতন নিরক্ষর দেশে। সোভিয়েট রাশিয়া এই ছায়াচিত্রের সাহায্যে যেভাবে দ্রুত জাতির মানসিক শিক্ষার ভিত্তি গঠনে কৃতকার্য্য হয়েছে, তার সফল উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রের কাছে, সেই দাবী আমরাও করবো। মন্ত্রীদের শফর বা সরকারী কর্ম্মচারীদের সচিত্র বিজ্ঞাপন নয়, ছায়াচিত্রের এই লোকশিক্ষা-ব্রতের উপাদান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আজকে আমরা দেখতে চাই, আমাদের রাষ্ট্র ছায়াচিত্রের সাহায্যে লোকশিক্ষার সেই অতি আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনে তৎপর হয়েছেন এবং সেখানে জাতির মানসিক চেতনার উন্নয়নের কাজে উনিশ শ' পাঁচের চেয়ে শিক্ষাপ্রদ কাহিনী আর দুটো নেই। সেদিনকার প্রাণ-বহ্নির শিখা আজও অনির্ব্বাণ জ্বলছে, আজ শুধু প্রয়োজন সেই মূল বহ্নিশিখার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। একবার ভেতরে সেই প্রাণ-বহ্নি যদি জ্বলে ওঠে, তাহলে বাইরের বহু জটিলতা আপনা থেকে সহজ হয়ে যায়। জাতির প্রাণের সঙ্গে আজকের যুগের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হলো, আমাদের নতুন রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষার দায়িত্ব।

এই নব জাগ্রত জাতির প্রাণ পড়ে আছে উনিশ শ' পাঁচে। অতীতে আমরা কোন ভুল করেছিলাম বা আমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় করেছিল বলে, সমগ্র অতীতকে এড়িয়ে চলতে হবে, এর চেয়ে ভুল আর কিছু হতে পারে না। যে জাতির প্রাণ বলিষ্ঠ, তার বলিষ্ঠতার মধ্যে সব কিছু ত্রুটিকে স্বীকার করে তার ঊর্দ্ধে সে উঠতে পারে।

ছায়াচিত্রে এই জাতীয় কাহিনীকে বলে documentary. এখানে সেই ভাবেই ছায়াচিত্রের চিত্র-পর্য্যায় অনুসরণ করে এই কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করেছি···

যদি এই কথা-চিত্রের ভেতর থেকে পাঠক সেদিনকার বাংলার বিকশিত মনের আংশিক পরিচয়ও পান, তাহলে নিজেকে সার্থক মনে করবো]

একটা কালো বোর্ডের ওপর দেখা গেল, একটা হাত খড়ি দিয়ে ভারতবর্ষের মানচিত্রের আয়তন-রেখা এঁকে গেল···

মানচিত্রের মাঝখানে একটা উঁচু দণ্ডের ওপর য়ুনিয়ন জ্যাক বাতাসে উড়ছে—

ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের মাটিতে এক একজন কৃষ্ণকায় লোক ঘুমিয়ে আছে···

ঘুমন্তদের দেশ···

হঠাৎ মাটিতে ফাটল দেখা গেল···সেই ফাটলের ভেতর থেকে একটু একটু করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে···

দেখতে দেখতে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী শূন্যে গিয়ে কতকগুলি সংখ্যায় পরিণত হলো···

১···৯···০···৫···

সংখ্যাগুলো দ্রুত কাঁপতে থাকে—তা'থেকে যেন বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়···

সে-তরঙ্গ-স্পর্শে দেখা গেল, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু বাংলায় যে লোকটী শুয়েছিল, সে উঠে বসলো···চারিদিকে চেয়ে সে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো···দৃষ্টিকে সংহত করবার জন্যে চোখের ওপর হাত তুলে দূরে গগন-সীমার দিকে চেয়ে দেখলো···

দেখে, হিমালয়ের তুহিন-রেখা ভেদ করে সূর্য্য উঠছে···

দৃশ্য বদলে যায়।

বড় বড় হরফে-লেখা দেয়াল-পঞ্জিকা ১৯০৫···জানুয়ারী···

শুকনো পাতার মত এক-একটী তারিখের পাতা ঝরে পড়ে।

অবশেষে আসে ২১শে ফেব্রুয়ারী···

কলিকাতার সিনেট হল···বাৎসরিক সমাবর্ত্তন উৎসব···

চারিদিকে উড়ছে য়ুনিয়ন জ্যাক···

হলের ভেতর সুসজ্জিত মঞ্চে···দাঁড়িয়ে লর্ড কার্জন···

বক্তৃতা দিচ্ছেন···

হলের পেছন দিকে গুরু-গম্ভীর শব্দের প্রতিধ্বনি আসছে···কিন্তু স্পষ্ট কিছুই শোনা যাচ্ছে না···

শ্রোতাদের মধ্যে একজন পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করেন, বড়লাট কি বল্লেন ?

পাশের লোকটী উত্তর দেয়, লর্ড কার্জন বলছেন, আমরা ভারতবাসী জানি না সত্যবাদিতা কি ! মিথ্যা বলা, ধূর্ত্তামি করা হলো আমাদের স্বভাব।

সভা ভেঙ্গে গেল।

দেখা গেল, সভার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আসন থেকে একজন

খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ উঠে আসছেন। তাঁর পাশে একজন তরুণী ইংরাজ-মহিলা। দুজনে কথা বলতে বলতে সভামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এলেন।

তাঁদের কাছে গিয়ে শোনা গেল, মহিলাটী পাশের সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে বলছেন, স্যার গুরুদাস, আপনি লর্ড কার্জনের Problems of the Far East বইখানা পড়েছেন ?

স্যার গুরুদাস বলেন, বইটা আনিয়েছি, এখনো পড়া হয়নি। কেন বলতো নিবেদিতা ?

ভগিনী নিবেদিতা হেসে বলেন, লর্ড কার্জন আজ ভারতবাসীদের প্রকাশ্য সভায় মিথ্যাবাদী বলে গালাগাল দিলেন। বল্লেন, সত্যের চরম আদর্শ কি তা জানতে হ'লে পাশ্চাত্য জগতের কাছে যেতে হবে। বেশী দূরে যেতে হবে না, তাঁর বই থেকেই আমি দেখিয়ে দেবো, কতখানি মিথ্যাবাদী তিনি নিজে···ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত স্তরের প্রধানতম প্রতিনিধি যিনি···

স্যার গুরুদাসের পাঠ-কক্ষ

Problems of the Far East থেকে ভগিনী নিবেদিতা পড়ছেন।

—আপনি জানেন স্যার গুরুদাস, লর্ড কার্জন এখানে আসবার আগে কোরিয়ায় গিয়াছিলেন, সেখানকার পররাষ্ট্র দপ্তরে। স্থানীয় এক মন্ত্রীর কাছ থেকে মর্য্যাদা আদায় করবার জন্যে কার্জন অবলীলাক্রমে নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলেন···

—কি রকম ?

—কোরিয়ায় প্রাচীন লোকদের একটা বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ চল্লিশ বছর বয়সের না হলে কখনই বিচক্ষণ হতে পারে না। কিন্তু

কার্জনের বয়স ছিল তখন মাত্র তেত্রিশ। কোরিয়ার সেই মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা যা হয়েছিল, তা তিনি নিজেই এই বইতে লিখেছেন, শুনুন্‌···সেই প্রবীণ মন্ত্রী কার্জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বয়স কত ?

কার্জন অনায়াসে উত্তর দিলেন, চল্লিশ !

কিন্তু চেহারা দেখে মন্ত্রীর সন্দেহ হলো। তাই আবার বল্লেন, কিন্তু আপনার চেহারা দেখলে আপনাকে খুব কম বয়সের বলে মনে হয় !

সত্যবাদী কার্জন সে কথার জবাব দিলেন এখানকার জল-হাওয়া আশ্চর্য্য রকমের ভাল···তাই এই মাস কতকের মধ্যে আমার চেহারা এত বদলে গিয়েছে !

নিষ্ঠাবান্‌ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিস্মিত হয়ে বল্লেন, তাই নাকি ?

ভগিনী নিবেদিতা বল্লেন, এতো সামান্য কথা···তার পরেও আছে ···কথা-প্রসঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা উঠলো এবং এই দেখুন সেই বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে লর্ড কার্জন অনায়াসে বল্লেন, আমার এখনও পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নি ! অথচ আমরা জানি, তাঁর বিবাহ তখন হয়ে গিয়েছিল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিষণ্ণ মুখে দূরের দিকে চেয়ে রইলেন।

ভগিনী নিবেদিতা বলে উঠলেন, এই দাম্ভিক বৃটিশ বাংলাকে দু'টুকরো ক'রে বাঙালীর অন্তরকে চিরকালের মতন পঙ্গু করে দেবার সংকল্প করেছে।

গম্ভীরভাবে স্যার গুরুদাস বললেন, তা জানি। কিন্তু সত্যিই কি কার্জন বঙ্গ-ভঙ্গকে আইনে পরিণত করবেন ?

বাঙ্গালীর অন্তরে এই আশঙ্কা তীব্রতর হয়ে ওঠে।

শেষ উপায় স্বরূপ তারা ঠিক করলো, ভারত-সচিবের কাছে আবেদন করবে।

সত্তর হাজার লোকের স্বাক্ষর নিয়ে একটা আবেদন সেই-সময়কার ভারত-সচিব লর্ড ব্রড্‌উইকের কাছে পাঠানো হলো।

আবেদন আর নিবেদন।

তার ফল, কয়েকদিন পরেই বাংলা জানতে পারলো। লর্ড কার্জন আগে ঠিক করেছিলেন, ঢাকা আর চট্টগ্রাম বিভাগকে নিয়ে আলাদা পূর্ব্ব-বঙ্গ গড়বেন। এখন সরকারী ঘোষণা পত্রে জানানো হলো, তার সঙ্গে রাজসাহী বিভাগও থাকবে।

বাঙ্গালী বুঝতে পারলো, পরাধীন দুর্বল জাতির আবেদন আর নিবেদনের কোন মুল্য নেই।

১৯০৫, ৭ই আগষ্ট, কলকাতার টাউন হল। লোকে লোকারণ্য। বৃহৎ হল উপচে জনতা বাইরের সিঁড়ি, সেখান থেকে রাস্তায় এসে সমবেত হয়েছে।

সভাপতি হয়েছেন কাশিমবাজারের রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

এই সভায় বাঙালী স্থির করবে, জনমতকে উপেক্ষা ক'রে লর্ড কার্জন যদি সত্যসত্যই বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করেন, বাঙালী তাহলে কি করবে?

সভায় প্রস্তাব করা হলো, যদি বঙ্গ-ভঙ্গ আইনে পরিণত হয়, তাহলে বাঙালী বিলাতী জিনিস বর্জ্জন করবে।

জনতার প্রতিনিধি-স্বরূপ বিপিনচন্দ্র পাল বল্লেন, ক্ষণস্থায়ী প্রতিজ্ঞা বা শপথ নয়। তাতে কোন ফল হ'বে না। আজ বাঙালীকে জীবন-মরণ পণ ক'রতে হবে। আমলাতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করতে হবে...আমরা নিরস্ত্র...আঘাত করবার কোনই কুঠার আমাদের নেই...আমাদের কুঠার হলো বয়কট...ধোপা, নাপিত, মুচি, খানসামা এরাই হলো আমাদের যন্ত্র, যা দিয়ে

আমলাতন্ত্রের মূলে আমরা আঘাত করতে পারি এবং আমরা তা করবো।

বিরাট জনতা আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সভায় ডাক্তার নীলরতন সরকার সাহেবী পোষাকে উপস্থিত ছিলেন। আবেগে গলা থেকে নেকটাই খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেন, প্রতিজ্ঞা করেন, আজ থেকে আর বিলাতী জিনিস ব্যবহার করবেন না।

আজ দূর থেকে, নাটকীয়তা বলে চোখে লাগে। কিন্তু গণ-উত্তেজনার মুহুর্তে ক্ষুদ্রতম জিনিসও বৃহত্তমের প্রতীক হয়ে ওঠে। ভিখারীর দেওয়া একটা পয়সা তার বাস্তবমূল্যের বহু শতগুণ মূল্য ধারণ করে।

সাধারণ বাঙালীর চেতনায় সুরু হয় এক মহা-আলোড়ন। এক অনিশ্চিত প্রাণ-চাঞ্চল্য ফুটে ওঠে সকলের চোখে মুখে।

এতদিন যে-কথা কাণে এসে লাগলেও, মনে স্পর্শ করেনি, সে-কথা জীবন্ত হয়ে বাঙালীর মনে প্রাণে তোলে অনুরণন।

তিন বছর আগে বেলুড়ে গঙ্গার ধারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যখন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন, সেদিন বাংলা দেশের অধিকাংশ লোকই সে-ঘটনার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ হয় নি। বিবেকানন্দ যে এসেছিলেন, রেখে গিয়েছেন যে কি প্রাণবাণী, তখনও সে-সংবাদ বাঙালীর মনে-প্রাণে গিয়ে পৌছয়নি।

তিন বছর পরে, সহসা বাঙালী আকাশে কাণ পেতে শুনতে পেলো সেই বীর সন্ন্যাসীর মাভৈ বাণী। উনিশ শ' পাঁচের প্রত্যূষে বাঙালী সহসা জেগে উঠে শুনলো, তার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নির্ভীক সন্ন্যাসী তাদেরই আহ্বান করছেন…

বিশ্বাস কর, এক মহৎ দায়িত্ব পালন করবার জন্যে তোমার এই দেহ, এই জীবন···

জন্ম থেকেই সেই মহৎ দায়িত্ব পালন করবার জন্যে তুমি বলি-প্রদত্ত···

এ জীবন বলি-স্বরূপ তোমাকে স্বেচ্ছায় নিবেদন করতে হবে···

তোমার দেবতা আজ চায় তোমার জীবন-বলি···

ত্রেত্রিশ কোটী নয়···আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্য্যন্ত তোমার সামনে তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা, সে তোমার জননী জন্মভূমি।

এতদিন পরে বাঙালীর মনে পড়লো সে-কথা।

এতদিন চোখের সামনে থাকলেও, যে-দৃশ্য বাঙালীর মনে গিয়ে রেখাপাত করেনি যে-দেবতাকে পূজা করেছে অথচ চেনে নি, জানে নি, উনিশ শ' পাঁচের প্রত্যূষে সহসা তার দৃষ্টি, তার মন, তার সমগ্র চেতনা সেই ইষ্টদেবীতে আরোপিত হলো,—

বঙ্কিমচন্দ্র যে দেবী মূর্ত্তির বিগ্রহ রচনা করে সাহিত্যের বেদীতে অধিষ্ঠিত করে রেখে গিয়েছিলেন, আজ এলো লগ্ন সেই দেবীকে চেনার, জানার। বাঙালী চেয়ে দেখলো, তার অন্তর আলো করে রয়েছে বিশ্বজননী তার দেশজননীর রূপে।

যে-মন্ত্র পড়েছিল পুঁথির নির্জীব জগতে, অক্ষরের প্রাণহীন রাজ্যে, সহসা তা দিব্য জ্যোতিতে হয়ে উঠলো প্রাণময়, পুঁথি থেকে এলো প্রাণে···

বাঙালীর প্রাণ থেকে বিনির্গত হলো মাতৃ আবাহন-মন্ত্র,—বন্দেমাতরম্।

অক্ষর হলো বিদ্যুৎ।

জড়ের মধ্যে উদ্ভাসিত হলো প্রাণ চৈতন্য।

১৯০৫, ৩০শে আশ্বিন।

লর্ড কার্জন ঘোষণা করেছিলেন, ঐ দিন বঙ্গ-ভঙ্গ আইনে পরিণত হবে।

বাঙালী উৎকণ্ঠিত হয়ে জেগে বসে ছিল। মনে ক্ষীণ আশ ছিল, হয়ত শেষ মুহূর্ত্তে জনমতের দাবীকে স্বীকার করে লর্ড কার্জন মত পরিবর্ত্তন করবেন।

লর্ড কার্জন তা করলেন না।

২৯শে আশ্বিন, রাত্রি। প্রতীক্ষার শেষ রাত্রি।

ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে জাতির আশা। ফলে প্রভাতে বিদেশী শাসকের কলমের খোঁচায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে বাংলার দেহ, পঙ্গু হয়ে যাবে তার অন্তর।

মুমূর্ষু রোগীর শিয়রে যেমন রাত জাগে ব্যথাতুর মন, তেমনি ভাবে ২৯শে আশ্বিনের রাত জেগে কাটালো বাঙালীর মন।

বাঙালীর নেতারা প্রতীক্ষমান রাত্রির অন্ধকারে সমবেত হয়ে, শপথ রক্ষার ব্রত গ্রহণের আয়োজন করলেন।

সমগ্র জাতির প্রতীক্ষায় বেপথু অন্তরের সুবিপুল বেদনা নিজের অন্তরে নিয়ে, সেই জাগরণী ঊষার অদূর-আগত আলোক-তোরণ-দ্বারে দেখছি জাতির কবি রচনা করছেন, জাতির জাগরণ মাঙ্গলিক,—

বাংলার মাটী, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান্।

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক
সত্য হইক হে ভগবান্।
বাঙালীর প্রাণে বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক
এক হউক হে ভগবান্।

৩০শে আশ্বিন···অবসান প্রতীক্ষার রাত্রি। এসেছে প্রভাত, নতুন প্রভাত, নব-জীবমের প্রভাত।

দলে দলে তরুণ ব্রতীর দল নগ্নপদে যাত্রা করে, পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরে।

জাতির কবি, আজ জাতির নব-জাগরণের পুরোহিতরূপে নগ্নপদে সেই নব-ব্রতীদের পুরোভাগে এগিয়ে চলেন রাজপথ দিয়ে গঙ্গার তীরে।

নব-প্রভাতের আলোকে সকলে একসঙ্গে অবগাহন করেন গঙ্গা-নীরে, ভারত-ভাগ্য-বাহিনী ভাগিরথী-নীরে······

পুণ্য-স্নান-অন্তে সহস্রকণ্ঠে গঙ্গার তীর প্রকম্পিত করে তোলে ধ্বনি, বন্দেমাতরম্।

সকলের সামনে দাঁড়িয়ে সকলে, সেই পুণ্য নদীকে সাক্ষ্য রেখে, শপথ গ্রহণ করে, বিদেশী-বর্জ্জনের শপথ।

এই দিনটীকে প্রতিদিন থেকে স্বতন্ত্র করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বাহ্নেই এক ইস্তাহার প্রচার করেন।

"আগামী ৩০শে আশ্বিন বাংলা দেশ আইনের দ্বারা দ্বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য এই দিনকে আমরা বাঙালীর রাখী-বন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূতা বাঁধিয়া দিব। রাখী-বন্ধনের মন্ত্রটী এই: ভাই ভাই এক ঠাঁই।"

কবির নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী স্নান-অন্তে প্রত্যেকের হাতে হলুদ-রঙা রাখী বেঁধে দেয়।

সেই নব-সঙ্কল্পের প্রাতে জাতির নব-যাত্রা-লগ্নে জাতির কবি রুদ্রকণ্ঠে তাদের আশ্বাস দেন,...

ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে,
ততই মোদের বাঁধন টুটবে।

মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্-ধ্বনিতে শহরের রাজপথ প্রকম্পিত করে নবীন ব্রতীর দল কবির গান কণ্ঠে নিয়ে পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করে বেড়ায়।

রাত্রি-প্রভাতের সেই নব সঙ্কল্পের তরঙ্গ শহর ছাড়িয়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে আছড়ে পড়ে।

পথে, ঘাটে, মাঠে, বাটে সর্ব্বত্র, বাঙালী রাখী হাতে অপরের হাতে রাখী বাঁধে।

সেদিন কলিকাতায় বাড়ীতে বাড়ীতে অরন্ধন।

উপবাসের মধ্যে দিয়ে এই জাতীয় বেদনাকে চিহ্নিত করে রাখা।

নিরস্ত্র জাতির শস্ত্রহীন প্রতিবাদ! দোকানী দোকান বন্ধ করে। গাড়োয়ান গাড়ী চালায় না। কুলি, মেথর, মুটে সবাই সেই একটী দিনের নৈষ্কর্ম্মে অন্তরের প্রতিবাদ জানায়।

চার পাঁচ বছরের শিশু, তাদেরও মনে ছোঁয়া লাগে। পাড়ার পাড়ায় বাড়ীতে বাড়ীতে নিঃশব্দে প্রবেশ করে তারা গোয়েন্দাগিরি করে, রান্নাঘরে গিয়ে দেখে, উনুন জ্বলছে কিনা!

বলে, উনুন ভেঙ্গে দেবো···একটা দিন না খেলে কি হয়?

একটা নিঃশব্দ প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে সমগ্র জাতির অন্তর সেই প্রথম একটা মিলন-বিন্দুর দিকে আকৃষ্ট হলো······

ভাঙ্গতে গিয়ে লর্ড কার্জন বাংলার ভাঙা মনকে জোড়া লাগাতেই সাহায্য করলেন।

মানুষের ইতিহাসে অন্যায় আঘাত এমনিভাবেই তার নিজের উদ্দেশ্যকে নিজেই ব্যর্থ করে দেয়।

তাই বিচ্ছেদের আশঙ্কা নিয়ে এলো মিলনের অনিবার্য্যতাকে!

মিলতে হবে, এক হতে হবে।

এক জাতি, এক প্রাণ, এক ভগবান।

তারই প্রতীক স্বরূপ বাঙালী স্থির করলো, তারা গড়ে তুলবে, মিলন-মন্দির, ফেডারেশন হল। বাঙালী ডাক দিলে ভারতের অন্য সব প্রদেশকে, অন্য সব প্রদেশের লোকদের।

বাঙলা তার জাগরণের মূহুর্ত্তে, প্রদেশকে দেখেনি, দেখেছিল প্রদেশময় ভারতবর্ষকে।

বাংলার জাতীয়তা-আন্দোলন বাঙালীর নিজের জাগার আন্দোলন নয়, বাঙালীর সঙ্গে মারাঠীর, পাঞ্জাবীর, বেহারীর, রাজপুতের, মাদ্রাজীর মিলনের আন্দোলন।

সেদিন সেই প্রথম রাখী-বন্ধনের দিনে বাংলার নায়কেরা স্থির করেছিলেন, তাঁরা বাংলাদেশের রাজধানীতে গড়ে তুলবেন, ফেডারেশন হল, যেখানে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক একসঙ্গে মিলে গড়ে তুলবে এক-ভারতবর্ষকে।

সেদিন বেলা তিনটের সময় হ'বে সেই মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন।

চারিদিক থেকে লোক সেই মধ্যাহ্ন সূর্য্যের খর-তাপকে অগ্রাহ্য করে সমবেত হয়েছে। বাংলার অধিকাংশ জন-নায়ক আজ একত্র সমবেত হয়েছেন। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন, অগ্রজ জন-নায়ক আনন্দমোহন বসু।

কিন্তু বহুদিন থেকে কঠিন রোগে তিনি শয্যাশায়ী। রোগ ক্রমশ মৃত্যুমুখী হয়ে উঠতে লাগলো। আজ তিনি মুমূর্ষু। উত্থান-শক্তি রহিত।

কিন্তু এ মুহূর্ত্ত তো জীবনে আর ফিরে আসবে না। মুমূর্ষু আনন্দমোহন স্থির করলেন, তিনি সভায় যাবেন, ষ্ট্রেচারে শুয়ে।

সেই অবস্থায় ষ্ট্রেচারে শুয়েই তিনি সভাস্থলে এলেন। এবং সেই অবস্থাতেই সেই মৃত্যুপথযাত্রী সেদিন সমগ্র জাতিকে আহ্বান করে বল্লেন…

আমার সামনে সেইদিন উপস্থিত, যেদিন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে অনন্তের পথে আমাকে যাত্রা করতে হবে। আজ এই যে আপনাদের দেখলাম, হয়ত এই আমার শেষ দেখা…

…আমি ঋষি নই, কোন-ঋষির পদধূলি গ্রহণেরও যোগ্য নই,… তবু আজ আমি, যিনি সকলের পিতা, ভারতবাসী ও ইংরাজ উভয়েরই পিতা, তাঁকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তিনি আমাকে এই দিন পর্য্যন্ত জীবিত রেখেছেন, আমি যাবার আগে দেখে যেতে পারলাম এই এক-জাতির অভ্যুদয়…

এই যে মিলন-মন্দিরের ভিত্তি আজ প্রতিষ্ঠিত হলো, এই অখণ্ড বঙ্গভবন, এর ভিত্তি শুধু এক টুকরো মাটির ওপর নয়, এর ভিত্তি আমাদের সকলের অশ্রু-ধৌত আর্দ্র হৃদয়ের ওপর···এই শোণিতহীন নবতর মহাসংগ্রামক্ষেত্রে আজ দেবতারা এসেছেন উর্দ্ধ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে।"

শোণিতহীন নবতর মহাসংগ্রামক্ষেত্র···কংগ্রেসের সংগ্রামের পূর্ব্বাভাস···

আনন্দমোহনের ভাষণের পর শিখগুরু কুঁয়ার সিংহ কৃপাণ-ধারী শিখ-অনুচরদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। বাংলার পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ উঠে নিজের হাতে শিখগুরুর হাতে রাখী বেঁধে দিলেন, বল্লেন, বাংলার আর পাঞ্জাবের এই প্রেমবন্ধন হোক্ অটুট।

তারপর জাতির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, "যেহেতু বাঙালী জাতির সার্ব্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, অতএব আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমগ্র বাঙালী জাতি আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব, তাহার সকলেই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন!

সভা ভঙ্গ হলো।

ষ্ট্রেচারে শুয়ে আনন্দমোহন একবার সকলের দিকে ফিরে চাইলেন। তাঁর দুচোখ দিয়ে দরদরধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, বন্ধু, বিদায়!

যুবকেরা হুড়োহুড়ি করে তাঁর ষ্ট্রেচারের কাছে এলো। তারা নিজেদের কাঁধে তুলে নিলো ষ্ট্রেচার।

কলকাতার সেই সভার অনুরূপ সভা বাংলার জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো।

দলে দলে ছাত্রেরা স্কুল ত্যাগ করে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে পথঘাট মুখরিত করে, বিলাতী বর্জ্জনের শপথের কথা জনে জনে পৌঁছে দিতে অগ্রসর হলো।

ছাত্রদের মুখে মুখে নতুন সঙ্গীত মুখরিত হয়ে উঠলো।

জাতীয়তার সঙ্গীত, নব-জাগরণের রণ-সঙ্গীত।

রবীন্দ্রনাথের বীণায় গানের পর গান বেজে ওঠে। সে-গানের ভাষা অমূর্ত্ত শক্তিরূপে বাঙালীর চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে।

বিদেশী সিডিশন আইনের শৃঙ্খলের ভেতর থেকে গেয়ে উঠে বাঙালী কবি এক অপরূপ মাতৃ-বন্দনার গান।

রজনী সেন গোবিন্দ দাস, মুকুন্দ দাস, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, সরলা দেবী...

দেখা দেয় নামহীন চারণের দল। নাম তাঁদের হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু তাঁদের স্মৃতি বেঁচে আছে লোকের মুখে মুখে, পথচারী ভিক্ষুকের গানে গানে।

যাত্রার আসরে মুকুন্দ দাস, মথুর সাহা, ভূষণ দাস এই নতুন সুর পৌঁছে দেন পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে জাতির সাধারণের কাছে।

পুরাণ আর ইতিহাসের দিকে নতুন করে ফিরে যায় বাঙালী।

জন্মাষ্টমী আসে, কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কাহিনী নিয়ে...সে কাহিনীর মধ্যে ভাষার কৌশলে ফুটে ওঠে আজকের মন...আজকের বেদনা আইনকে ফাঁকি দিয়ে...

বাঙালীর নাট্যকার যাত্রা করে রাজপুতানার অতীতে...মেবার পাহাড় নতুন মুর্ত্তি ধরে জেগে ওঠে চেতনায়...মোগল রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে বেরিয়ে আসে পিঞ্জরাবদ্ধ প্রতাপাদিত্যের আত্মা উনবিংশ-শতাব্দীর প্রাঙ্গণে...

অতি-সাধারণ মানুষের ভাষায় কোথা থেকে এসে লাগে অনন্যসাধারণ সুর,—

"আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ
ডাকিছেন সবে, সাজ্‌রে সাজ!"*

সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে বিদেশী শাসকের জ্ঞান-পাপী মন।

তরুণ ছাত্ররা যদি বিদ্যালয় ছেড়ে পথে পথে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি তুলে বেড়ায়, তাহলে তারা লেখাপড়া শিখবে কি করে? তাদের শিক্ষায় যে ব্যাঘাত ঘটবে! ছাত্রদের শিক্ষার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে শাসকেরা।

তাই একদিন স্কুলের শিক্ষকেরা পেলেন সরকারী শিক্ষা-মহল থেকে এক জরুরী সার্কুলার।

"সকলের অবগতির জন্য…

জানাইতেছি যে, ছাত্রদিগকে যে ভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে নিয়োজিত করা হইতেছে, তাহাতে তাহাদের শিক্ষার সমূহ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক এবং ছাত্ররা তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী বর্জ্জন জাতীয় অপকার্য্য হইতে যদি বিরত না হয়, তাহা হইলে… সেই বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে…

শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের দমন না করিতে পারে, অবিলম্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিয়া জানাইবেন,

যদি তাহাতেও ছাত্ররা দমিত না হয়, তাহা হইলে শিক্ষকদের স্পেশাল কনষ্টবলের কাজ করিতে হইবে,

প্রত্যেক থানার পুলিশ কর্ম্মচারী ছাত্রদের উপর কড়া নজর রাখিবেন এবং অন্যায় দেখিলেই রিপোর্ট করিবেন।"

---

* অজ্ঞাতনামা লেখক

তলায় স্বাক্ষর করলেন সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ কার্লাইল।

কার্লাইলের এই ঘোষণা তরুণ ছাত্রদের আরো উত্তেজিত করে তুল্লো।

পুলিশের হাতে দিয়ে দিলো, ছাত্র-শাসনের ভার।

বাংলার পল্লীতে পল্লীতে দুরন্ত ছেলেদের সঙ্গে লাগলো প্রভুভক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীদের সংঘর্ষ।

সমগ্র ইতিহাস অপেক্ষা করেছিল, এই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্যে...

এতদিন পর্য্যন্ত বিদেশী শাসকেরা মুষ্টিমেয় শাদা চামড়াকে দিয়ে এত বড় একটা বিরাট দেশকে শাসিয়ে রেখেছিল। এমন একটা শক্তির আড়ম্বরের আয়োজন করে রেখেছিল, যাতে করে এই বিরাট নিরস্ত্র জনতার বদ্ধমূল ধারণা জন্মায়, তাদের বিপক্ষ এই বিদেশী শক্তি অজেয়, সকল রকম আঘাতের উর্দ্ধে...শাসিতের মনে এই অজেয়ত্বের দূরত্ব রচনা করাই ছিল শাসকের শাসনের মূলতত্ব।

একমাত্র প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে সম্ভব ছিল, এই শক্তির মিথ্যা পৌরণিকতাকে ভেঙ্গে ফেলা।

শাসক তাঁর শাসিতের মধ্যে দীর্ঘতর হয়ে উঠেছিল যে ভয়ের ছায়া, তাকে বিলুপ্ত করবার একমাত্র উপায় ছিল, সে ভয়কে দূরে না রেখে কাছে টেনে নেওয়া।

ইতিহাস প্রস্তুত হচ্ছিল, জাতিকে এই শিক্ষা দেবার জন্যে।

বিদেশী শাসকেরা নিজেদের ভুল দিয়ে সেই ইতিহাসকেই করলো সাহায্য।

কার্লাইল-সারকুলারে বলীয়ান হয়ে পুলিশ ছাত্রদের উপর সামান্যতম অছিলায় জঘন্যতম নির্য্যাতন করতে সুরু করে দিল।

নির্য্যাতন নিয়ে এলো তার অনিবার্য্য সুফল, জাগরণ।

ঢাকা, রাজসাহী, বর্দ্ধমান, বরিশাল, ফরিদপুর···সব দিক থেকে আসতে লাগলো সংবাদ।

ছাত্র আর শিক্ষকদের ওপর পুলিশের জুলুম।

যদি কোন দুঃসাহসী ছাত্র বা শিক্ষক অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে আসে আদালতের কাছে প্রতিকারের আশায়, আদালত দ্বিগুণ করে দেয় শাস্তির মেয়াদ।

আশ্বিন মাস। মাদারীপুরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন মিঃ ক্যাটেল, পাটওয়ালা সাহেব। সাহেবের মাথায় ছাতা নেই। কিন্তু সাহেবের সামনে দিয়ে একজন স্কুলের ছাত্র আসছিল, তার মাথায় ছাতা। সাহেব তাতে অপমানিত বোধ করলেন। উদ্ধত ছাত্রটি সাহেবের আদেশ সত্ত্বেও ছাতা বন্ধ করলো না। সাহেব ছাত্রটাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করলেন।

ক্যাটলের বিরুদ্ধে মামলা আনা হলো।

মামলায় সাব্যস্ত হলো, বালকের আঘাত যদিও সত্যি, কিন্তু আসলে বালকই দোষী, কেন না সে তার দুর্ব্যবহারের দ্বারা সাহেবকে উত্তেজিত করেছিল।

এবং উত্তেজিত সাহেব স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়ায় ছেলেটাকে মেরেছেন।

অতএব আসল দোষী ছাত্রটা। ক্যাটেল সাহেব নির্দ্দোষ।

তাতেও কিন্তু ক্যাটেল সাহেবের রাগ পড়লো না। এবার ক্যাটেল সাহেব নিজে নালিশ করলেন। অনন্তমোহন দাস আর তার সঙ্গে আর তিনজন ছাত্র তাঁকে প্রহার করেছে।

স্কুল বিভাগের সরকারী কর্ত্তা মিঃ স্টেপলটন নিজে তদন্ত করতে এলেন এবং তদন্ত করে অভিযুক্ত ছাত্রদের দোষী সাব্যস্ত করলেন। হুকুম দিলেন, মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে তাদের এনে, প্রত্যেককে ২৫ ঘা করে বেত মারা হবে এবং প্রকাশ্যভাবে ছাত্রদের এই শাস্তি সেই স্কুলের হেডমাষ্টারকেই নিজের হাতে দিতে হবে।

শুধু মাদারিপুরে নয়, বাংলার বিভিন্ন শহরে অনুরূপ ঘটনা ঘটতে লাগলো।

বিদেশী শিক্ষার বাহন সেই স্কুল আর সেই বিদেশী শিক্ষার বিরুদ্ধে একটা সজাগ অসন্তোষ জেগে উঠলো জাতির মনে।

জাতির কবি মর্ম্মান্তিক ভাষায় জাতির শিক্ষার এই গলদ দেখিয়ে বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিলেন। স্থির করলেন, নিজের শক্তি অনুযায়ী তিনি জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্বরূপ বিদ্যায়তন গড়ে তুলবেন। শিক্ষা আর কুটীর শিল্পের ক্ষেত্র বেছে নিয়ে তিনি স্বতন্ত্রভাবে হাতে-কলমে এক নতুন পরীক্ষা আরম্ভ করে দিলেন।

তাঁর কলম থেকে অনর্গল বেরুতে লাগলো, রুদ্রের আবাহন মন্ত্র… …কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ নিদ্রাহীন প্রহরীর মত সেই সদ্য-জাগ্রত জাতিকে তাঁর প্রাণ-বহ্নিতে উচ্চকিত করে তুল্লেন……সেদিনকার অধিকাংশ জনসভায় দেখি, দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘকায় স্বর্ণ-বর্ণ অগ্নি-মন্ত্র-উদ্গারী জাতির কবি, জাতির পুরোহিতরূপে……

সেবার ২১শে কার্ত্তিক, বিজয়া একাদশী…

কলকাতায় বাগবাজারে পশুপতি বসুর ঐতিহাসিক গৃহ-প্রাঙ্গণে জাতি সমবেত হয়েছে বিজয়া-সম্মেলনের উৎসবে। প্রতিদিন বাংলার বিভিন্ন পল্লী-অঞ্চল থেকে আসছে মাতৃ-পূজার অভিনব সব সংবাদ…

বেদনায়, লাঞ্ছনায় সুরু হয়েছে মায়ের বোধন। সেই বেদনার মধ্যে দিয়ে বাঙালী অনুভব করছে, এতদিন যা করে নি, তার জন্মভূমির সত্তার পবিত্রতাকে, তার সত্তার এক-প্রাণ এক দেহত্বকে। দেহের এক জায়গায় একটু আঘাত লাগলে, সারা দেহে পড়ে যায় সাড়া।

সেই ঐতিহাসিক বিজয়া-সম্মেলনের দিকে চেয়ে দেখছি, সেখানেও সেই সুবিপুল জনতার ঊর্দ্ধে দাঁড়িয়ে জাতির প্রতিনিধি, জাতির কবি। সেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর-ভাষায় যে বিজয়া-সম্ভাষণ জাতিকে শুনিয়েছিলেন, বাংলা-ভাষার কারু-শিল্পের অক্ষয় নিদর্শন হয়ে তা আছে ঃ জাতির চেতনার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতির ভাষাও তখন এক অভিনব প্রাণ-দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠছে···

"হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ কর।

উত্তরে হিমালয়ের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্ব্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত কর···

যে-চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর।

শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর।

অস্ত সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর।

আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্ব্ব পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও···

আজ বাংলা দেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র

ঢালিয়া দিয়াছে, সেই নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের বন্দেমাতরম্ গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্, একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্ব-ভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর।

বাংলার মাটী বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।"

দুটী শব্দ······সমুদ্র-তরঙ্গের অবিরাম গর্জ্জনের মত সারা দেশের বুকের ভেতর থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। শত সহস্র কণ্ঠের সংস্পর্শে দুটী শব্দ হয়ে উঠলো একটা সমগ্র সাহিত্য···

সব মন্ত্র নিঃশেষ হয়ে এলো মাত্র দুটি শব্দে বন্দেমাতরম্!

সমগ্র জাতির অব্যক্ত অন্তরের শত সহস্র আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তি নিলো সেই দুটী শব্দের অন্তরে···

অভিধান ছাড়িয়ে তার অর্থ ছড়িয়ে পড়লো জাতির চেতনায়।

প্রতিদিনের ব্যবহারে, সেই দুটী শব্দ, বিশাল বটের মতন আচ্ছন্ন করে ফেল্লো সমগ্র জাতির চিত্ত-ভূমি···

জাতির ইতিহাস রচনা করলো জাতির মর্ম্ম-সঙ্গীত।

মহাকাল স্বয়ং তাতে করলো সুর-সংযোজনা।

• •

বিদেশী সরকার নতুন সারকুলার ঘোষণা করলো, মানুষের বিরুদ্ধে নয়, সেই দুটী শব্দের বিরুদ্ধে···

পথে ঘাটে, প্রকাশ্য স্থলে, পার্ক প্রভৃতিতে কেউ বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি তুলতে পারবে না। তুল্লে আইনে কঠোরভাবে দণ্ডিত হবে।

তলায় স্বাক্ষর দিলেন, পি, সি. লায়ন!
কার্লাইল সারকুলারের সহোদর লায়ন্স্ সারকুলার।

নব-জাগ্রত জাতি শুনলো না সে নিষেধ।
লিভারপুল থেকে আসে লবণ, ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আসে কাপড়…
ছাত্রেরা পথে লবণের গাড়ী আটকায়, বিলিতী কাপড়ের দোকান পুড়িয়ে দেয়…
আর ধ্বনি তোলে বন্দে মাতরম্।
পুলিশ প্রহার করে, যাকে সামনে পায় তাকেই ধরে নিয়ে যায়…স্কুলের দরজায় তালা পড়ে…
কিন্তু আঘাত পেয়ে ছাত্ররা ওঠে আরো উত্তেজিত হয়ে।
গোপনে কবিতা ছাপা হয়ে বিলি হয়…নাম থাকে না লেখকের…

"নগরে নগরে জ্বালারে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচারে ভাই!"

অপমানের জ্বালা তীব্র হয়ে ফুটে ওঠে ভাওয়ালের কবির কণ্ঠে…

"স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে,
এ দেশ তোমার নয়,
যে দেশ যাদের অধিকারে,
তারাই তাদের বলতে পারে,
কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয়?"

যুগান্তরের ব্যবধান পেরিয়ে আজও প্রাণে এসে বেঁধে সূচের মতন ভাওয়াল কবির আর্ত্তনাদ।

এই যদি রে বৃটীশ-বরণ, মরণ কারে কয়?

বিদেশী শাসক যাদের পিঠে এঁকে দিল বেতের চিহ্ন, কারাগারে দিল লৌহ-শৃঙ্খল···

জাতি স্থির করলো, তাদের দেবে উপহার, ফুলের মালা, স্বর্ণপদক, লকেট···

প্রকাশ্য সভা করে নির্য্যাতিতদের দেবে অভিনন্দন, এবং অভিনন্দনের স্মৃতিস্বরূপ কোন স্থায়ী উপহার নিদর্শন।

বিদেশী সরকার দেয় প্রভুভক্তির বদলে উপাধি, সম্মানের পদক আর ক্রস্···

দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জাতি তৈরী করবে দেশ-প্রেমিকের সম্মাননার নতুন ঐতিহ্য, বীরপূজার নতুন ব্যবস্থা।

১৯০৮-এর ফেব্রুয়ারীতে দেশবাসীর পক্ষ থেকে কাব্যবিশারদ আর জন-নায়ক সুরেন্দ্রনাথ এগিয়ে আসেন সেই বীরপূজার আয়োজন করতে।

স্থির হয়, কলকাতায় টাউন হলে প্রকাশ্যসভায় জাতি তার নির্য্যাতিত কর্ম্মীদের অভিনন্দন দেবে···তার জন্যে তৈরী হয় বিশেষ পদক আর স্বর্ণ-রৌপ্য গোলক।

এই উদ্দেশ্যে টাউন হল ভাড়া করবার জন্যে যথারীতি সুরেন্দ্রনাথ তদানীন্তন করপোরেশনের প্রধান কর্ত্তা এ্যালেন সাহেবের কাছে চিঠি লেখেন।

এ্যালেন সাহেব সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিলেন।

সভার আয়োজন চলতে লাগলো। বিভিন্ন প্রদেশের নির্য্যাতিত কর্ম্মীদের আমন্ত্রণ করে কলকাতায় আনানো হলো। যাঁরা তখনও কারাগারে, তাঁদের পত্রের দ্বারা জানানো হলো। সভার দিন সংবাদ-পত্রে ঘোষিত হলো।

সভার দুদিন আগে হঠাৎ এ্যালেন সাহেবের পত্র এলো···

My dear Sir,

When you asked me for permission to hold a meeting at the Town Hall to express sympathy with the sufferers in the cause of Swadeshi, I did not clearly understand the object of your meeting....

সভার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সাহেব তখন বুঝতে পারেন নি। এই ক'দিনের মধ্যে সাহেবের উর্ব্বর মস্তিষ্কে সহসা জ্ঞানালোকের দীপ্তিতে সেই উদ্দেশ্যের স্বঠিক স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সরকার যাদের দোষী বলে সাজা দিয়েছেন, সেই অপদার্থ লোকদের মালা দিয়ে অভিনন্দিত করা হবে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সরকারকেই গালাগাল দেওয়া হবে। অতএব এহেন অপকার্য্যের জন্যে তিনি টাউন হল ছেড়ে দিতে পারেন না।

কয়েকদিন আগেও এ্যালেন সাহেবের অন্তরে এই জ্ঞানালোকের সহসা উন্মেষ ঘটতে পারতো কিন্তু তাহলে উদ্যোগকারীরা নতুন করে আয়োজন করবার সময় পেতো। এ সুবিধা সাহেব দেবেন কেন?

উদ্যোগকারীরা মহা বিপদে পড়লেন। নির্দ্দিষ্ট আয়োজন সমস্ত পণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু অনুষ্ঠান তো বর্জ্জন করা চলে না। তাঁরা কিছুতেই তা বর্জ্জন করবেন না।

রাতারাতি চেষ্টার ফলে পুরাণো গ্রাণ্ড থিয়েটারের পরিত্যক্ত হলটী পাওয়া গেল। রাতারাতি হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে চারিদিকে ছড়ানো হলো।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সভা বসলো।

মাঝখানে একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেল। বাইরের লোক অবশ্য তার কিছুই জানতে পারলো না।

সভার উদ্যোগকারীরা আইনত সেই একটী দিনের জন্যে টাউন হল ভাড়া নিয়েছিল এবং কাগজে কলমে করপোরেশন তাতে সম্মতি দিয়েছিল।

সেইজন্যে কয়েকদিন পরেই স্থরেন্দ্রনাথ করপোরেশনের কাছ থেকে একটা বিল পেলেন, রীতিমত করপোরেশনের ছাপ দেওয়া ফর্মে।

১৪ই তারিখ, টাউন হল ভাড়া নেওয়ার দরুণ, গ্যাসের আয়োজন বাবদ ৩০৲, আলোর বাবদ ৫৲ এবং পুলিশের খরচ বাবদ ৮৲, মোট ৪৩৲ টাকা—

যে হল তাঁরা ব্যবহার করতে পান নি, তার দরুণ ৪৩৲ টাকা তাঁদের করপোরেশনকে দিতে হবে……

একেই বলে, হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।

১৯০৬, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, গ্রাণ্ড থিয়েটার হলে সভার অধিবেশন বসলো, নির্য্যাতিত দেশকর্ম্মীদের জাতি প্রকাশ্যভাবে অভিনন্দিত করবে…বাস্তব-স্মৃতিস্বরূপ তাঁদের পদক দেওয়া হবে।

বিভিন্ন জেলা থেকে লাঞ্ছিত ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করে নিয়ে আসা হয়েছে। সভার বেদীর একধারে তাঁরা বসে।

সভাপতি, ইণ্ডিয়ান মিরর কাগজের স্বনামখ্যাত সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরাট ইতিহাসে সেদিনকার এই সভার কাহিনী মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু সমগ্র অতীতেরদিকে চেয়ে আজ দেখছি, সেদিনকার সেই সামান্য আয়োজন এক বিরাট সম্ভাবনার প্রতীক স্বরূপ বিরাজ করছে। রুদ্ধকণ্ঠ জাতির ভীত মৌনতার মধ্যে সেদিনকার সভাপতির অভিভাষণ জাতির ভয়-মুক্ত অন্তরের প্রথম প্রকাশ্য অভিব্যক্তিরূপে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরউজ্জ্বল থাকা উচিত, স্বাধীনতার ইতিহাসকারের কর্ত্তব্য হলো, বিস্মৃতির গর্ভ থেকে তাকে উদ্ধার করে রাখা—

নরেন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন, আজিকার এই

ঘটনা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক নতুন যুগান্তরের নির্দ্দেশ জানায়···আজিকার এই ঘটনার মধ্যে সমগ্র বাঙালীর ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ নিহিত রইলো···যে জাতি তার নির্য্যাতিত আপন-জনকে সম্মান করতে শিখেছে, সে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশার কোন কারণই নেই।

সভাপতির অভিভাষণের পর সভার পক্ষ থেকে কাব্য-বিশারদ মহাশয় অনুপস্থিত নেতাদের কয়েকখানি পত্র পড়ে শোনালেন। তার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের পত্র ঃ

"বাংলাদেশের বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহা-দিগকে পীড়িত করিয়াছে তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইয়াছেন, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্য রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে। যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগৎ-সমক্ষে তাঁদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ যে কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক বি শেষরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের জীবন সার্থ । রাজ-রোষরক্ত-অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমার সঞ্চার না করিয়া বারবার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে 'বন্দে মাতরম্'। ২রা ফাল্গুন, ১৩২০, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তারপর সুরেন্দ্রনাথ কম্বুকণ্ঠে বক্তৃতা দিলেন···এই নির্য্যাতনের পথে জাতির তরুণদের নব-অভিযানে আহ্বান করলেন···

সমগ্র জনতা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে দাঁড়িয়ে উঠলো।

সভার তদারকের ভার নিয়েছিল ভবানীপুরের স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায়। আজ এই সম্প্রদায়ের নাম শহরের ইতিহাস থেকে মুছে গিয়েছে কিন্তু সেদিন শহরের নবজাগ্রত জীবনে এই সমাজ-সেবকের দল সর্ব্বদাই দেখি সর্ব্বত্র এগিয়ে গিয়েছেন।

সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে এই দলের স্বেচ্ছাসেবকেরা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে, নব আগমনী···

"দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে
এস চণ্ডী যুগান্তরে,
পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে
অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে···"

তারপর এই অভিনব সভার প্রধান উদ্যোক্তা কাব্যবিশারদ মহাশয় সভার আসল কাজ আরম্ভ করেন, নির্য্যাতিত ব্যক্তিদের পুরস্কার দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে ২১টা পদক, ৫০টা লকেট ১০টী ব্রুচ তৈরী করা হয়েছিল। এ ছাড়া এক রকম রুমাল তৈরী করা হয়েছিল, রুমালের ওপর প্রশংসা-পত্র ছাপানো ছিল। জাতীয় স্মৃতি-সৌধ তৈরী করে এই সব নিদর্শন তাতে সংগৃহীত করে রাখা দরকার, সেই হবে আমাদের ন্যাশনাল মিউজিয়াম্। মহাত্মা গান্ধী পরবর্ত্তী যুগে কারা-ভীতি ভাঙ্গবার জন্যে যে আন্দোলন করেন, তার প্রথম সূত্রপাত দেখি কাব্যবিশারদের অনুষ্ঠিত এই সভায়।

কাব্যবিশারদ একে একে নাম ধরে বিভিন্ন জেলার নির্য্যাতিত ব্যক্তিদের আহ্বান করতে লাগলেন···তাঁদের প্রত্যেকের পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গলায় পরিয়ে দেন জাতির সম্মাননার নিদর্শন। সকলের সমবেদনার অনুভূতির ভেতর দিয়ে বেদনা

আর নির্য্যাতনের স্মৃতি গ্লানিমুক্ত নবশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

হরিবপুর থেকে এসেছেন বিপিনচন্দ্র গুহ। সম্মাননার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি কাব্যবিশারদের হাতে ন'আনা পয়সা তুলে দিলেন। তিনি যখন কারাগার থেকে মুক্ত হন, তখন কারারক্ষী তাঁর পাথেয়ের জন্যে এ ন'আসা পয়সা দিয়েছিল। এ পয়সা তিনি নিজের জন্য ব্যবহার করেন নি। এই ন'আনা পয়সা জাতীয় ভাণ্ডারে দেবার জন্যে কাব্যবিশারদের হাতে তুলে দেন।

এই ন'আনা পয়সা জাতির ভাগ্য-লক্ষ্মী আলাদা করে তাঁর সিঁদুর কৌটাতে তুলে রেখেছেন। বন্দেমাতরম্।

এসেছেন বসন্তকুমার দত্ত। তাঁর বালক পুত্র শয্যাশায়ী··· পুলিশের বেতের ঘা তার পিঠে এখনো শুকোয় নি। তাই পুত্রের হয়ে তিনি এসেছেন সভার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাতে। বন্দেমাতরম্।

বরিশালে যখন লোকে বিলাতী জিনিসের দোকান একেবারে বন্ধ করে দিল তখন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাক সাহেব নিজে একটা বাজার গড়ে তুল্লেন। বাজার বসলো, দোকান হলো, কিন্তু দোকানদার আর পাওয়া যায় না। অবশেষে একজন দোকানদার পাওয়া গেল। দোকান খুলে সে বসে থাকে, খদ্দের আর কেউ আসে না। দোকানের সামনে বসে সেই নামহীন দোকানদার আপনার মনে স্বরচিত গান গায়···

"এ বাজারে ভাই আমি একাই দোকানদার"

গানের অর্থ বুঝতে পেয়ে জ্যাক সাহেব বাজার দেন তুলে। হারিয়ে গিয়েছে সেই রসিক দোকানদারের নাম!

নোয়াখালিতে ছেলেরা মেতে উঠেছে বন্দেমাতরম্ গানে। পথে

ঘাটে অষ্ট প্রহর ওঠে ধ্বনি, বন্দেমাতরম্। জেলার কর্তাদের মাথায় আসে এক নতুন ফন্দী। ছেলেদের দলে ছদ্মবেশে এক চর এসে ঢোকে। স্বদেশের কথায় চোখ দিয়ে তার জল ঝরে পড়ে। ছেলেদের ডেকে বল্লে, ওরে, বন্দেমাতরম্ হলো আমাদের ইষ্ট-মন্ত্র। ইষ্ট-মন্ত্র জোরে উচ্চারণ করতে নেই। শাস্ত্রের নিষেধ। মনে মনে তা জপ করতে হয়।

নাবালক জমিদার নগেন্দ্রনাথ গুহরায় জবাব দেয়, মরবার সময় ইষ্টমন্ত্র জোর করেই বলতে হয়। আজ যে আমরা মৃত্যুশয্যায়, তাই জোর করেই আজ ইষ্টনাম উচ্চারণ করতে হবে।

নাবালক জমিদারের সম্পত্তি তখন ছিল কোর্ট অফ ওয়ার্ড্স্-এর তত্ত্বাবধানে। কথাটা কর্তাদের কাণে গেল। বালক তখন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু পরীক্ষা আর দিতে পারলো না, স্কুল থেকে তাকে বিতাড়িত করা হলো। কাব্যবিশারদ বালকের হাতে পরিয়ে দিলেন রজত-বন্ধনী।

ময়মনসিং থেকে এসেছেন, হেডমাষ্টার বিপিনচন্দ্র দাস। ময়মনসিং থানার পুলিশ ইন্স্পেক্টর তাঁকে হুকুম করে পাঠান, স্কুলের ছাত্রদের উপস্থিতি রেজিষ্টার থানায় তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। বিপিনচন্দ্র তা অগ্রাহ্য করেন। পরিণামে, তাঁর শাস্তি কারাবাস।

এসেছেন যতীন্দ্রনাথ সিংহ। এই কলকাতার কলেজের ছাত্র। পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের হয় সংঘর্ষ। পুলিশ ধরে নিয়ে যায় যতীন্দ্রনাথকে। থানায় নিয়ে গিয়ে হাতে হাতকড়ি দিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর রক্ত-চোখে জিজ্ঞাসা করেন, এখন তোমার বন্দেমাতরম্ কোথায়? শৃঙ্খলিত হাত বুকের ওপর রেখে যতীন্দ্রনাথ উত্তর দেন, এই বুকের ভেতর।

এইভাবে সেই সভায়, একে একে ঢাকা, বরিশাল, খুলনা,

রাজসাহী, মৈমনসিং, চব্বিশ পরগণা সমস্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা··· পাশাপাশি এক জায়গায় একত্র হয়ে দাঁড়ায়। টুকরো টুকরো আগুন আলাদা আলাদা হয়ে যা জ্বলছিল, এক জায়গায় এসে তারা দাবানলে পরিণত হয়।

কলকাতার এই সভার পর বাংলার নায়কেরা বেরিয়ে পড়লেন, সারা বাংলার ভেতরে এই জাগরণের শুভ সংবাদকে প্রচার করবার জন্যে। বন্দেমাতরম্ এই ধ্বনির মধ্যে নিহিত রইলো জাগরণের বীজ, বীজ-মন্ত্র। বাংলার উন্মুক্ত প্রান্তরে দু'হাতে তাঁরা ছড়িয়ে চল্লেন এই বীজ।

নতুন পূর্ব্ববঙ্গের নতুন লাট তখন নিযুক্ত হয়েছেন ফুলার সাহেব। ঢাকা তাঁর রাজধানী।

কলকাতা থেকে বিপিনচন্দ্র চল্লেন পূর্ব্ববঙ্গের পথে। নামলেন ঢাকায়। ভাগ্যক্রমে যে ট্রেণে তিনি ঢাকায় পৌঁছলেন, সেই ট্রেণেই আসছিলেন লাট ফুলার সাহেব। এক সঙ্গেই তাঁরা দু'জনে নামলেন ষ্টেশনে। অসংখ্য ছাত্র ফুলের মালা দিয়ে বিপিনচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করলো, তাঁর জয়ধ্বনিতে ষ্টেশন মুখরিত হয়ে উঠলো। একটি কণ্ঠও লাটসাহেবকে বরণ করলো না···সমগ্র জনতার উপেক্ষার ভিতর দিয়ে ফুলার প্রবেশ করলেন তাঁর রাজধানীতে। সেদিনকার সেই উপেক্ষা জমা হয়ে রইলো তাঁর মনে, জন-নায়কের অভ্যর্থনার প্রতিধ্বনির সঙ্গে মিশে।

কলকাতা থেকে জন-নায়কেরা অগ্রসর হয়ে চলেছেন বরিশালের দিকে।

বাংলার মানচিত্রে তখন জেগে উঠেছে বরিশাল, এক অপরূপ ব্যক্তিত্বের প্রেরণায়···অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর নাম। দুর্ব্বল, ভীতু, চিত্ত-দোদুল, আধখানা মানুষদের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ পূরো মানুষ, লোহার-পাঁজরা দিয়ে গড়া বুকের দুই ধার। কালো পাথরের দেহ··· পাথরের মতন শক্ত মন।

ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট সভয় বিস্ময়ে দেখলেন, যদিও তিনি এই জেলার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা কিন্তু এই একটী মানুষকে ঠেলে তাঁর একটা আদেশও এখানে বলবৎ হয় না। সারা-বাংলা বিলিতী বর্জ্জনের ব্রত নিয়েছে কিন্তু বরিশালের মতন কোথাও এই আন্দোলন এত সার্থক হয় নি। অশ্বিনীকুমারের বিনা আদেশে বরিশালে এক চামচে বিলিতী নুন বা এক টুকরা বিলিতী কাপড় সেদিন ঢুকতে পারে নি।

তাই সেবার বাঙালী ঠিক করলো বরিশালে তারা সমবেত হবে। বরিশালে বসবে বাংলার প্রাদেশিক সম্মেলন। সে-সম্মেলনের সভা-নায়ক হলেন একজন বাঙালী মুসলমান, রসুল সাহেব। কংগ্রেস তখন আঁতুড় ঘরের ভয়ের চৌকাট পেরোয় নি। বৃটিশ যুবরাজের ভারত-আগমন উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত।

বাংলার নেতারা নদীপথে দুই তীর বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে কাঁপিয়ে তখন চলেছেন বরিশালের দিকে—পূর্ণস্বাধীনতার ব্রতে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে।

একদল চলেছেন খুলনা দিয়ে। আর এক দল চলেছেন নারায়ণ-গঞ্জ দিয়ে। জলপথে প্রত্যেক ষ্টেশনে যেখানে যেখানে ষ্টীমার থামে, দলে দলে লোক ছুটে আসে নদী তীরে।

খুলনার ঘাটে ষ্টীমার এসে থামবার বহু আগেই দূর দুরান্তর গ্রাম থেকে লোকে এসে জড় হয়েছে। কৃষক এসেছে লাঙল ফেলে, ছাত্র এসেছে স্কুল ফেলে।

সমস্ত ঘাট ঘিরে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র পুলিশ। জনতা অনিশ্চিত ভয়ে

মৌন দাঁড়িয়ে। পুলিশ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জনতাকে সাবধান ক'রে দিয়েছে, কেউ যেন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি না তোলে।

ক্রমশ ষ্টীমার, নেতাদের নিয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে আসে। তীরবদ্ধ সেই মৌন মানুষের সারের দিকে চেয়ে ষ্টীমার থেকে নেতারা ধ্বনি দিয়ে ওঠেন, বন্দেমাতরম্।

পুলিশ লাঠি হাতে জনতার দিকে ফিরে দাঁড়ায়।

ষ্টীমার থেকে আবার আসে ধ্বনি বন্দেমাতরম্।

জনতার ভেতরে ফুটে উঠে একটা নির্বাক চাঞ্চল্য। কিন্তু পুলিশের ভয়ে কেউ সে ধ্বনির প্রত্যুত্তর দিতে পারে না।

আবার ষ্টীমার থেকে আসে ধ্বনি, বন্দেমাতরম্।

তীরস্থ জনতাকে ঠেলে কয়েকজন তরুণ যুবা জলের দিকে এগিয়ে আসে। তার স্বরে চীৎকার করে ওঠে, বন্দেমাতরম্!

একজন একটা উঁচু জায়গার ওপরে ওঠে দাঁড়ায়। মৌন জনতাকে কশাঘাত করে ব'লে ওঠে, বল ভাই বন্দেমাতরম্! যদি বাঙালী হও, প্রাণ খুলে আজ বল, বন্দেমাতরম্!

সঙ্গে সঙ্গে সেই মৌন নদী-তীর সহস্র কণ্ঠের চীৎকারে জাগ্রত হয়ে ওঠে। কে যেন এক নিমেষে ভেঙ্গে দিলো শতাব্দীর ভীত নিঃস্তব্ধতা। সে বিপুল চীৎকার শুনে চারদিক থেকে লোক ছুটে এলো নদী-তীরে, মাঠ থেকে চাষী এলো, দোকান ফেলে দোকানী এলো, মোট ফেলে মুটে এলো, সবাই এক সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলো, বন্দেমাতরম্! সেই সম্মিলিত কণ্ঠের ধ্বনিতে সেই নদী-তীরের আকাশে বিকশিত হয়ে উঠলো অদৃশ্য বায়ু-তরঙ্গে একটী দিব্য নির্ভিকতা...

সেই সম্মিলিত কণ্ঠের ধ্বনি-তরঙ্গের বিপুলতার সামনে পুলিশের উদ্যত লাঠি আপনা থেকে নেমে এল।

নারায়ণগঞ্জের পথ দিয়ে চলেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকাবাহী সুরেন্দ্রনাথ···শতাব্দীর জড়তার ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যেই যিনি নিয়ে এসেছিলেন বজ্রের আরাব কণ্ঠে বহন করে···

কাতারে কাতারে লোক তীর-পথ দিয়ে ছুটেছে তাঁর ষ্টীমারকে শুধু দেখবার জন্যে—ষ্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়ে বার্দ্ধক্য শুভ্র মূর্ত্তিতে, প্রাচীন পুরোহিতের মতন দূর থেকে হাত তুলে তিনি প্রত্যভিবাদন জ্ঞাপন করেন···

সহসা উৎসাহ তীর থেকে নেমে পড়ে নদী-নীরে।
তাঁর প্রতিমুর্ত্তি পালেতে টাঙ্গিয়ে ছোট ছোট নৌকো নিয়ে লোকে জলপথে অনুসরণ করে তাঁর ষ্টীমারকে।

তাঁর এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে তীরে তীরে জেগে ওঠে বাংলা···

বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট অতি স্পষ্টভাষায় আদেশ জারী করেছেন, বরিশালের পথে একটি কণ্ঠেও যেন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারিত না হয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি বা কোন নেতা প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে দলবদ্ধভাবে যেতে পারবে না। এই আইন অমান্য করলে পুলিশ বেয়নেট দিয়ে শাস্তি দিতে দ্বিধা করবে না।

নেতাদের ষ্টীমার ঘাটে এসে উপস্থিত হলো।

ষ্টীমারের ডেক থেকে নেতারা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

কিন্তু তীর থেকে তার কোন উত্তর এলো না।

অভ্যর্থনা সমিতির বিশিষ্ট সভ্যরা নৌকো করে তীর থেকে ষ্টীমারে এসে নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের কথা জানান।

একদল যুবকও ষ্টীমারে এসে নেতাদের সঙ্গে দেখা করে। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যরা বলেন, এখন পুলিশের সঙ্গে হাঙ্গামা করলে,

সমস্ত অধিবেশনই পণ্ড হয়ে যাবে। অতএব এখন নীরবেই শহরে প্রবেশ করা যাক।

যুবকেরা বলে, এই ভাবে নীরবে ভয়ে ভয়ে নেতারা যদি বরিশালে প্রবেশ করেন, তাঁরা করতে পারেন কিন্তু আমরা তা হলে সে সভায় যাব না।

একটা আসন্ন মহাবিপদের ছায়া নদী-তীরে ঘনায়মান হয়ে ওঠে।

অধিবেশনকে যাতে পুলিশ আগে থাকতে পণ্ড করবার সুযোগ না পায়, সেইজন্যে বহু বাক্-বিতণ্ডার পর স্থির হলো, নীরবেই নেতারা এখন শহরে প্রবেশ করবেন।

নীরবে নেতারা ভূকৈলাশের রাজবাটীতে উপস্থিত হলেন।

পুলিশ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল!

যাতে নেতারা ষ্টীমার থেকে কোন কুলীর সাহায্য না পান তার জন্যে পুলিশ আগে থাকতেই কুলীদের শাসিয়ে ষ্টীমার ঘাট থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু বরিশালের ছেলেরাও প্রস্তুত ছিল।

তারা মাল-কোঁচা বেঁধে ষ্টীমার ঘাটে নেতাদের মোট আনন্দে কাঁধে তুলে নিল, আনন্দে মোট কাঁধে করে রাস্তা দিয়ে যে যার নির্দ্দিষ্ট ডেরার দিকে চল্লো।

পুলিশের প্রথম চাল ব্যর্থ হয়ে গেল।

সেদিন বাঙালী সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরা রাস্তা দিয়ে কাঁধে করে মোট বইতে একটা নতুন আনন্দের স্বাদ পেয়েছিল।

দুপুর। বেলা দুটো নাগাদ অধিবেশনের আমন্ত্রিত নেতারা ভূকৈলাস রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হলেন।

সকালেই নেতারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে স্থির করেছিলেন, আজ কোন মতেই পুলিশের সঙ্গে কোন সংঘর্ষ করা চলবে না।

পুলিশ সংঘর্ষ বাধাবার জন্যে কিন্তু প্রস্তুত হয়েছিল।

ভূকৈলাস—রাজবাড়ীর দরজার কাছাকাছি এসে পৌঁছিলেন, রজনীকান্ত গুহ, বিভূতি রায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আর ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এন্টি-সারকুলার সোসাইটীর প্রতিনিধিবর্গ।

রাজবাড়ীর তোরণের সামনেই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুলিশের কর্তা মিঃ কেম্প।

ফণিভূষণ দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই কেম্প পুলিশকে ইঙ্গিত করলো। একজন পুলিশ এগিয়ে এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো। তাকে ভ্রূক্ষেপ না করে ফণিভূষণ যেই অগ্রসর হতে যাবেন, অমনি পুলিশ সজোরে লাঠি তুলে তাঁকে আঘাত করলো। চিবুক ফেটে রক্ত ঝরে পড়লো।

কৃষ্ণকুমার ক্রুদ্ধ হয়ে সোজা কেম্পের সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন অকারণে এই লোকটীকে মারলেন?

কেম্প গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, আমি দল বেঁধে কাউকে এগুতে দেবো না।

তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কৃষ্ণকুমার জবাব দিলেন, দল বেঁধে যাওয়া যাকে বলে আমরা তা যাইনি। আপনারাই অন্যায়ভাবে আমাদের গতিরোধ করেছেন। আমরা এই সভার প্রতিনিধি আমাদের পথ ছেড়ে দিন।

ঝগড়া বাধাবার জন্যে তৈরী কেম্প ব'লে উঠলো, না এরা সবাই প্রতিনিধি নয়।

কৃষ্ণকুমার তেমনি কণ্ঠে জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই, আমরা সবাই প্রতিনিধি!

কৃষ্ণকুমারের ভঙ্গী দেখে কেম্প কি মনে করে পথ ছেড়ে দিল। মাটীতে রক্ত ঝরে পড়লো দেখেও, স্বেচ্ছাসেবকেরা কিছু বল্লেন না। নেতাদের আদেশ, আজ পুলিশের সঙ্গে কোন সংঘর্ষই তাঁরা হতে দেবেন না।

পাশেই ঢাকার নবাব সলিমুল্লার কাছারী বাড়ী। সেই কাছারী বাড়ী আজ পুলিশের ব্যারাকে পরিণত হয়েছে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে কাছারী বাড়ীর পুলিশেরা হাতের অস্ত্র সোজা করে ধরে। লাঠি, তলোয়ার, বন্দুক, তিন রকম অস্ত্র নিয়েই পুলিশ প্রস্তুত।

বাড়ীর ভেতরে যত খুসী তারা চেঁচাক, কিন্তু রাস্তায় একজনকেও তারা 'বন্দেমাতরম্' বলতে দেবে না!

কিন্তু সে আইন অমান্য করবার জন্যে আজ বরিশালও প্রস্তুত।

কিছুক্ষণ পরে রাজ-বাড়ীর ভেতর থেকে একজন, দুজন করে ক্রমশঃ দলে দলে লোক রাস্তায় বেরিয়ে এলো!

তাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন, জন-নেতারা, তাঁদের সামনে তাঁদের নায়ক সুরেন্দ্রনাথ।

রাস্তায় নেমে সুরেন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পেছনে একদল ছেলে সমবেতকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে একদল পুলিশ লাঠি আর সঙ্গীণ তুলে তাদের ঘিরে দাঁড়ালো।

মিঃ কেম্প একজন স্বেচ্ছাসেবকের সামনে এসে হুকুম করলো, গা থেঁকে ঐ ব্যাজ খুলে ফেলে দাও!

প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবকের গায়ে ছিল বন্দেমাতরম্ লেখা উড়নীর মতন ব্যাজ।

দুহাত দিয়ে উড়ানী আটকে ধরে স্বেচ্ছাসেবক জবাব দেয়, কখনই নয়।

কেম্প নিজে এগিয়ে এসে হাত দিয়ে তা টেনে খুলে ফেলতে চেষ্টা করে। যুবক প্রাণপণে চেপে ধরে চীৎকার করে ওঠে, বন্দেমাতরম্!

সেই ধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেম্প হুকুম দিল, মারো!

তখন চারদিক থেকে সশস্ত্র পুলিশ সেই নিরস্ত্র জনতার ওপর নেকড়ে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রহারে প্রহারে প্রত্যেককে জর্জ্জরিত করে তুল্লো। কিন্তু একজনও পালালো না, একজনও বুকের উত্তরীয় খুলে দিলো না। যত প্রহার খায়, ততই তারা চীৎকার করে ওঠে, বন্দেমাতরম্। রক্তে লাল হয়ে গেল বরিশালের মাটী। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পুলিশ আক্রমণ করলো। নেতাদের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। আহত বালকেরা সংজ্ঞাহীন মাটীতে লুটিয়ে পড়ে, তখনও অস্ফুট উচ্চারণ করে, বন্দেমাতরম্!

মনোরঞ্জন গুহঠাকুর তার কিশোর বালক চিত্তরঞ্জন পিতার সঙ্গে সেই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সামনেই ছিল।

পিতার গায়ে লাঠি পড়তে পুত্র এগিয়ে গিয়ে নিজের দেহে লাঠির আঘাত গ্রহণ করে।

সেই কিশোর বালকের ঔদ্ধত্য দেখে বীরপুরুষ পুলিশের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সকলে মিলে হকি বলের মতন সেই কিশোর বালককে মারতে মারতে জনতা থেকে দূরে নিয়ে ফেলে। কিন্তু এমনি উদ্ধত বালক যে কিছুতেই মুখ থেকে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি বন্ধ করে না। পুলিশও বদ্ধপরিকর, দেখবে তার মুখ বন্ধ হয় কি না। আঘাতে আঘাতে কিশোর বালকের সারা দেহ রক্ত-রাঙা হয়ে উঠেছে। প্রায় অচৈতন্য হয়ে আসবার উপক্রম হয়েছে। পুলিশ মারতে মারতে বালককে এক পুকুরের ধারে নিয়ে ফেল্লো। পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে বালক তখনও যথাসম্ভব তারস্বরে চীৎকার করে বন্দেমাতরম্! পুলিশ বেয়নট দিয়ে তাকে ঠেলে পুকুরের জলে ফেলে দিল এবং সেই অবস্থায় যতক্ষণ না বালকের মুখ থেকে কথা বন্ধ হলো, ততক্ষণ সমানে প্রহার করে চল্লো। যখন বালকের রক্তাক্ত দেহ জ্ঞানহীন অসাড় হয়ে পুকুরের জলে আধ-ডোবা পড়ে রইলো, তখন নিশ্চিন্ত মনে জয়গৌরবে বীরবাহিনী ফিরে গেলো। সেই

পুকুরের জলেই বালকের অসাড় দেহ ডুবে যেতো কিন্তু একজন হিন্দুস্থানী পুলিশের মনে সহসা দয়ার উদ্রেক হলো। জল থেকে সেই অসাড় দেহকে টেনে তুলে পুকুরের পাড়ের ওপর ফেলে রেখে চলে গেল।

বহুক্ষণ পরে খুঁজতে খুঁজতে পিতা যখন পুত্রের সেই অসাড় দেহ দেখতে পেলেন, পুকুর থেকে জল তুলে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। চোখ খুলতেই বালক পিতাকে দেখে বলে উঠলো, বাবা, আমি শেষ পর্য্যন্ত বন্দেমাতরম্ বলেছি···হয়ত আর একটা লাঠি পড়লে আমি মরে যেতাম।

দুই চোখ জলে ভরে আসে পিতার। পুত্রের মাথা তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুই মরে গেলেও আমি দুঃখ পেতাম না, তোর মতন ছেলে যার তার দুঃখ নেই।

রাজবাড়ীর ফটকের সামনে পুলিশ দুর্দ্দণ্ড-প্রতাপে, মারণ-লীলা চালিয়ে চল্লো। একজন পুলিশ কৃষ্ণনগরের উকীল বেচারাম বাবুকে লাঠীর আঘাতে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য করে তাঁর ওপর আবার যখন লাঠী চালাতে যাবে, তখন পেছন থেকে কৃষ্ণকুমার ছুটে এসে তার গলা টিপে ধরলেন এবং গলার জামা ধরে টানতে টানতে তাকে কেম্পের সামনে এনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কৃষ্ণকুমারের মাথা দিয়ে তখন রক্ত ঝরে পড়ছিল। কেম্পকে ডেকে বল্লেন, তোমার গুণ্ডাদের সরে যেতে বলো, নইলে আজ মহা-অনর্থ হবে!

আর একদিকে কাব্যবিশারদ দেখেন, একদল বালকের ওপর পুলিশের লোক নির্ম্মমভাবে লাঠী চালাচ্ছে। সেখানে ছুটে গিয়ে তিনি পুলিশের লাঠীর সামনে ছেলেদের আগলে দাঁড়ালেন। পুলিশ সমবেতভাবে তাঁর ওপরই আক্রমণ সুরু করে দিলো। হয়ত সেখানে কাব্যবিশারদের জীবন শেষ হয়ে যেতো, হঠাৎ একজন হিন্দুস্থানী হাবিলদার চীৎকার করে আদেশ দিল, মারো মৎ, ব্রাহ্মণ হ্যায়!

অনাবৃত-দেহে ব্রাহ্মণের সেই শুভ্র উপবীত সেদিন কাব্যবিশারদের প্রাণ রক্ষা করেছিল।

যখন এই নারকীয় লীলা চলছিল, সুরেন্দ্রনাথ তখন একদল ছেলে নিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন। পিছনের চীৎকারে তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। কিন্তু কয়েক পা ফিরতেই, কেম্প ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে এলো এবং একদল পুলিশ সুরেন্দ্রনাথকে ঘিরে ফেল্লো। কেম্পের হুকুমে সুরেন্দ্রনাথ সেইখানেই বন্দী হয়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে বন্দী অবস্থায় ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো। যাবার সময় সুরেন্দ্রনাথ বলে গেলেন, তোমরা কিন্তু সভার কাজ বন্ধ করো না…

মিঃ রসুলকে নিয়ে সেই অবস্থার মধ্যেই সভার অধিবেশন বসলো। নিদ্রিত ভারতে বাংলা নিলো প্রথম অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা।

ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন সাহেবের বাড়ীতেই আদালত বসলো। দরজার বাইরে কাব্যবিশারদ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি নেতারা সুরেন্দ্রনাথকে অনুগমন করে এসেছিলেন।

এমার্সন সাহেব সাক্ষী তলব করতে কেম্প কাব্যবিশারদকেই নিয়ে উপস্থিত করলো।

সহসা এমার্সন সাহেব সেই নগ্ন-গাত্র হ্যাটহীন অসভ্য মূর্ত্তি দেখে রাগে চীৎকার করে উঠলেন, কেম্পকে ধমক দিয়ে বললেন, মাথায় হ্যাট নেই, এ কোন্ অসভ্য লোককে এনে হাজির করলে?

তারপর কাব্যবিশারদের দিকে চেয়ে গর্জ্জে উঠলেন, গেট আউট!

কাব্যবিশারদ হেসে বাইরে চলে এলেন।

আসামীর তলব হলো। পুলিশ বন্দী সুরেন্দ্রনাথকে এমার্সন সাহেবের সামনে এনে হাজির করলো! সুরেন্দ্রনাথ সামনের একটা

খালি চেয়ারে যেই বসতে যাবেন অমনি এমার্সন বলে উঠলো, না··· তুমি আসামী···চেয়ারে বসবার তোমার অধিকার নেই !

সুরেন্দ্রনাথ গর্জ্জে উঠলেন, আমাকে এই ভাবে অপমান করবার জন্যেই কি আনা হয়েছে ?

সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে এমার্সন বলে উঠলো, তোমার ব্যবহারের জন্যে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত !

সুরেন্দ্রনাথ স্থির কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন, এ রকম ভাষা ব্যবহার করার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি !

এমার্সন—এ কথার মানে কি জানো ? তুমি আদালতকে অপমান করছো ?

সুরেন্দ্রনাথ—তাই যদি করে থাকি, তার বিচারের অধিকার তোমার নেই। /

এমার্সন—আমার কি অধিকার আছে বা না আছে, তা আমি বুঝি।

একজন পরামর্শ দিল সুরেন্দ্রনাথকে—ক্ষমা প্রার্থনা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন !

সুরেন্দ্রনাথ গর্জ্জন করে উঠলেন, না, আমি কোন অন্যায় করিনি যে ক্ষমা চাইবো !

এমার্সন—আমি তোমাকে ভেবে দেখবার জন্যে আর একবার সময় দিচ্ছি।

সুরেন্দ্রনাথ—আমি ভেবে দেখেছি। ক্ষমা প্রার্থনার মতো কোন অন্যায়ই আমি করি নি।

আদালত অবমাননার জন্যে ম্যাজিষ্ট্রেট দুশো টাকা ফাইন ধার্য্য করলেন।

সেই দণ্ড স্বীকার করে সুরেন্দ্রনাথ সভা-প্রাঙ্গণে আবার ফিরে এলেন। সমগ্র জনতা তাঁর জয়-ধ্বনিতে ফেটে পড়লো। সভায়

পুলিশের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গৃহীত হলো এবং এই অবস্থায় দেশের লোকের কি কর্ত্তব্য, তা স্থির করবার জন্যে পরের দিন সভা স্থগিত রইলো।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সংজ্ঞা-হীন বালক-পুত্রের কথা উল্লেখ করে বল্লেন, ধূলায় লুণ্ঠিত আমার পুত্রের সেই অচৈতন্য দেহ দেখে, আমার শুধু মনে পড়লো মাইকেলের সেই ক'টা লাইন,

> যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
> প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
> সদা....

দ্বিতীয় দিনের সভা যথারীতি পুনরায় বসলো।

সেদিন শহরে নানারকমের গুজব লোকের মুখে মুখে এক মহা-আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

সকলেরই ধারণা, আজ পুলিশ বন্দেমাতরম্ শুনলেই নির্ম্মমভাবে গুলি চালাবে।

সেই আতঙ্কের মধ্যে, দেখা গেল, দলে দলে শ্রেণীবদ্ধ লোক বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে বরিশালের পথ কাঁপিয়ে সভার দিকে অগ্রসর হলো। আজ জনতার সামনে এগিয়ে এলো, বরিশালের পুর-কামিনীরা। রাস্তায় শঙ্খধ্বনি করতে করতে তাঁরা শোভাযাত্রার পুরোভাগে অগ্রসর হয়ে চল্লেন। আঘাত খেয়ে বরিশালের দ্বিধাগ্রস্ত মন আজ জেগে উঠেছে। এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল।

আর একদিন এই আঘাতকেই মহাত্মাজী কৌশলে ভারতের গ্রামে গ্রামে আকর্ষণ করে এনেছিলেন।

আঘাতের সার্থকতা বরিশালই সেদিন প্রথম উপলব্ধি করে এবং আঘাতকারী শাসককে জানিয়ে দেয়, শাসিতের শৃঙ্খল শাসকের আঘাতেই খুলে যায়।

দ্বিতীয় দিনের সভায় ভবানীপুরের স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকেরা সভার প্রারম্ভে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন,

মাগো, যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
বন্দেমাতরম্ ব'লে।

অশ্বিনীকুমার প্রস্তাব করলেন, কাল যেখানে পুলিশ অত্যাচার করেছে, যেখানে প্রথম নিরীহ বালকের রক্ত পড়েছে, সেখানে এক স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলা হোক।

তৎক্ষণাৎ সভায় চাঁদা তোলা হলো।

মেয়েদের পক্ষ থেকে সরোজিনী বসু উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, যতদিন না এই বন্দেমাতরম্ না বলার অবৈধ আদেশ প্রত্যাহৃত হচ্ছে, ততদিন এ হাতে আর বলয় পরবো না!

তারপর সভার বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়ালো এক কিশোর বালক—রাজেন্দ্রলাল সাহা। কাব্যবিশারদ তার পরিচয় করিয়ে দিলেন, এই বীর বালক বিলাতী বর্জ্জন আন্দোলনের জন্য বন্দী হয়! আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বালককে যখন নাম সই করবার জন্যে কলম দেওয়া হয়, তখন বালক সেই কলম স্পর্শ করে না, বলে, এ বিলিতী কলম স্পর্শ করবো না। কারাগারে শীতে যখন তাকে কম্বল দেওয়া হয়, তখন সে কম্বল সে প্রত্যাখ্যান করে, বলে, এ বিলিতী কম্বল গায়ে দেবো না।

সকলে সমস্বরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলে সেই বীর বালককে অভিনন্দিত করে।

তারপর একে একে প্রস্তাব গৃহীত হয়, বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে, বিলিতী জিনিসের বিরুদ্ধে। পরিশেষে প্রস্তাব গৃহীত হয়, জাতীয় বিদ্যালয়ের…গোলামী-শিক্ষার কারখানা পরিত্যাগ করে নতুন জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে।

অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি।

সভা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন মিঃ কেম্প সশস্ত্র পুলিশ ফৌজ নিয়ে সভার দ্বার-প্রান্তে উপস্থিত হলেন! ফৌজকে দ্বারপ্রান্তে রেখে কেম্প সভার মধ্যে ঢুকতে গেলেন কিন্তু প্রবেশদ্বারে স্বেচ্ছাসেবক বাধা দিল।

—ক্যাপ্টেনের আদেশ বিনা সভার ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেবো না!

কেম্প ইঙ্গিতে ফৌজ দেখালো।

স্বেচ্ছাসেবক অচল অটল!

গোলমালে সভার ভেতর থেকে অশ্বিনীকুমার বেরিয়ে এলেন।

অশ্বিনীকুমাকে দেখে কেম্প তাঁর হাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের পরোয়ানা দিলেন—ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ, সভা ভেঙ্গে দিতে হবে।

বিপিনচন্দ্র ভীত হয়ে পড়লেন, বল্লেন, পুলিশ যখন হাঙ্গামার জন্যে এতই অস্থির, তখন সভা ভেঙ্গে দেওয়াই উচিত।

কৃষ্ণকুমার মিত্র রুখে দাঁড়ালেন, কখনই না। মিঃ কেম্প যদি ইচ্ছে করেন, জোর করে সভা ভেঙ্গে দিতে পারেন।

তখন কেম্প সভাপতির অনুমতি নিয়ে শ্রোতাদের কিছু বলতে চাইলো। সভাপতি অনুমতি দিলেন।

কেম্প বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাঁড়াতেই সহস্র কণ্ঠে ক্ষুব্ধ জনতা গর্জ্জন করে উঠলো, বন্দেমাতরম্।

সেই ধ্বনিতে ভীত হয়ে উঠলো কেম্প। বুঝলো, একটু বেশী সাহস দেখানো হয়ে গিয়েছে।

সামনেই সুরেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়েছিলেন। কেম্প তাঁর কাছে সরে গিয়ে ঈষৎ ম্লানকণ্ঠেই বলে ফেল্লেন, I hope, I am now safe!

জনতা তখন মুহুর্মুহু গর্জ্জন করে উঠছে বন্দেমাতরম্!

সভার ভেতর থেকে একজন দাঁড়িয়ে উঠে বললো, সাহেব বলো, বন্দেমাতরম্!

নিরুপায় কেম্প বলে উঠলো, বন্‌-ডে মাতরম্‌…

তখন জনতা শান্ত হলো। কেম্প ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ শুনিয়ে জনতাকে অনুরোধ করলো, বিনা শব্দে সভা ভেঙ্গে বাড়ী চলে যেতে!

জনতা আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো…তারা মরবে…কিন্তু সভা ছেড়ে যাবে না।

কেম্প নেতাদের জানায়, তা'হলে আমার ফৌজ গুলি চালাতে বাধ্য হবে।

কৃষ্ণকুমার মিত্র বললেন, বেশ তাই হোক।

সমস্ত সভার ওপর মৃত্যুর আশঙ্কা ঘনিয়ে আসে।

নায়কেরা দ্রুত পরামর্শ করেন। সভায় বহু বালক আর নারী উপস্থিত, অকারণে বহু প্রাণ নষ্ট হবে। এ সংগ্রাম তো এইখানেই শেষ হবে না।

অবশেষে তাঁরা সভা ভেঙ্গে দিতেই স্বীকৃত হলেন। কৃষ্ণকুমার বিষণ্ণ মনে সভা ছেড়ে চলে গেলেন।

সভা ভেঙ্গে দিয়ে যতীন্দ্রনাথ বল্লেন, আজ এই সভা ভেঙ্গে দেওয়া হলো…তোমরা যে যার ঘরে ফিরে যাও…বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে বসুক এইসভা…গ্রামে গ্রামে চলুক্‌ এই আন্দোলন…বাংলায় যেন একটুকরো বিলিতী জিনিস না প্রবেশ করে। আজ যে লাঠী আমাদের পিঠে এরা মারলো, যেদিন সেই লাঠী বিলেতে এর পিঠে পড়বে, সেইদিন আমাদের প্রতিশোধের দিন…সেই দিনকে এগিয়ে আনবার জন্যেই তোমরা যে-যার জীবনকে করো পণ…

সভা ভেঙ্গে যায়…

শূন্য-সভা পড়ে থাকে এক বিরাট নাট্য-লীলার স্মৃতি বহন করে।

সেদিনকার সেই প্রথম জাগরণের পুণ্যস্মৃতি আজও বাঁচিয়ে রেখেছে কাব্যবিশারদের সেই বরিশাল স্তুতি,…

"আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির ঘায়
ঐ যে মায়ের জয় গেয়ে যায়।
রক্ত বইছে শতধার
নাইকো শক্তি চলিবার
এরা, মার খেয়ে কেউ মা ভোলে না,
সহে অত্যাচার!
এত পড়ছে লাঠী ঝরছে রুধির
তবু হাত তোলে না কারো গায়!"

বড় দুঃখে বঙ্কিম বলেছিলেন, বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি।

দু'হাত দূরে পড়ে রয়েছে উনিশ শ' পাঁচের প্রভাত, অথচ আজকের তরুণ বাঙ্গালীর মনে, ভয়াবহ বেদনায় দেখছি, তার একটীও আলোক-ছটা এসে পড়ে নি।

বাঙ্গালী তার নিজের ঐতিহ্যের কাছ থেকে যেন ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে।

নিজের ছায়ার কাছ থেকে যেমন ছুটে পালানো যায় না, তেমনি যায় না নিজের ঐতিহ্য থেকে। যদি কখন সম্ভব হয়, তা হয় আত্মহত্যার রাত্রিতে।

তাই আজ সভয়ে আমার তরুণ সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করছি, সেই আত্মহত্যার নিবিড় রাত্রির অন্ধকার কি তোমার আমার শেষ গন্তব্য?

নিজেকে চেনা নিজেকে জানা, এই হলো সব শিক্ষার মূলকথা। তেমনি মূলকথা হলো, নিজের জাতিকে চেনা, নিজের জাতিকে জানা।

হে তরুণ, পায়ের তলায় যে ধূলিকণায় প্রতিদিন বিচরণ করছো, যে ধূলার মাতৃ-অঙ্কে এই জীবনের এই অধ্যায়ে প্রবেশ করেছ, শ্রদ্ধায় সেখানে মাথা ঠেকাও, তুলে লও সে স্বর্ণ-মুষ্টি···রেণু রেণু করে খুঁজে দেখো সেইখানে আছে তোমার প্রাণ-কণিকা···

হে ছাত্র তোমার সামনে প্রসারিত, সবুজে, হরিতে, শ্যামে, সুবর্ণে যে অপরূপ সুচিত্রিত পুঁথি, শ্রদ্ধায় হাতে তুলে লও সেই তোমার বর্ণ পরিচয়, পরিচয় হোক তোমার জীবন-ধাত্রীর অন্তরের সঙ্গে, সেখানে আছে ক্ষমা-সুন্দর প্রাণ-পূর্ণ মাতৃস্নেহ, অপার, উদার, জীবন-আনন্দ-দায়ী···

হে শিক্ষক, আজ এসেছে সেই সময়, যখন বহু দুঃখের মধ্যে, বহু অনশনের মধ্যে, আজ তোমাকেই নিতে হবে শেষ দুঃখের বোঝা, শতাব্দীর পুঞ্জীভূত ভুলের পাঠকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে নূতন করে তোমাকেই শিক্ষা দিতে হবে সঞ্জীবনী মন্ত্রের···অবিলম্বে, অচিরে। তার জন্যে তুমি কি নিজে হয়েছ প্রস্তুত? যে মন্দিরে এতদিন ধরে তুমি ছিলে পূজারী, চেয়ে দেখো, সে-মন্দিরে নেই কোন বিগ্রহ, শুধু মন্দিরের অভ্যন্তরের নিবিড় অন্ধকার রচনা করে আছে বিগ্রহের ছদ্মরূপ। আজ সেই অন্ধকারের ষড়যন্ত্র ভেদ করে, হে পুরোহিত, তোমাকেই করতে হবে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা। নতুবা তোমারই মন্ত্র ফিরে আসবে তোমারই নিধন-বার্তা নিয়ে।

চতুর্দ্দিকে গড়ে উঠেছে যে সব বিদ্যা-দানের কারখানা, বিদ্যালয়ের নামে গড়ে উঠেছে যে সব বিদ্যা-ব্যবসায়ের কেন্দ্র, যেখানে প্রকৃত বিদ্যা কেউ দানও করে না, কেউ গ্রহণও করে না, ভেঙ্গে দাও তার ইঁটের আর চূণের আর সুরকীর দেয়াল, জাতির শিক্ষা নিয়ে এই সুবৃহৎ আত্ম-প্রবঞ্চনার ভাঙ্গা সৌধের ওপর মেরামত করা আর চলবে না, বাইরে থেকে কলি ফিরিয়ে চূণকাম করলেই তার আবর্জ্জনা দূর হবে না···তার বালির ভিৎ থেকে সরিয়ে তাকে সুগভীর মাটীর ভিতে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। শুনতে পাচ্ছো না, তার ভেতর থেকে ভিৎ ধ্বসে-পড়ার আওয়াজ? নিজের মনে বিচার করে দেখো, কাকে দেবে দোষ। যা দাও নি, তা ফিরে পাবার আশা করা কি ভুল নয়?

যে বিশ্ববিদ্যালয় জাতির মর্ম্ম-বেদী থেকে ওঠে নি, তার বিশ্ব যতই বড় হোক, তা অন্ধকারেরই বিশ্ব।

মানব-জীবনের ইতিহাসে বহু আন্দোলন অতিথি হয়ে আসে, অতিথির মতন রাত্রি বাস করে, আবার চলে যায়।

কোন কোন আন্দোলন আসে নব-জাতকের মতন, নব-জন্মের মতন, চলমান জীবনের সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের স্থায়ী সম্পর্কের দাবী নিয়ে।

উনিশ শ' পাঁচ এসেছিল বাঙালীর জীবনে, অতিথির মতন নয়, নব-জাতকের মতন।

জাতির সঙ্গে সঙ্গে সে চলেছে এগিয়ে, পরমাত্মীয়ের মতন, ভেতর থেকে জুগিয়ে প্রয়োজন মত প্রাণ-রস।

তার জন্ম-ক্রন্দন তাই ধরে রেখেছিল সেদিনকার বাংলা-সাহিত্য। সে যে সত্যই এসেছিল, তার সার্থক প্রমাণ বাংলা কবিতায় গানে শাশ্বত মূর্ত্তিতে ফুটে ওঠে তার আগমনী।

সেই আগমনীর শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ! তাঁর বীণায় তিনি সেদিন ধরে রেখেছিলেন, তার মধ্যে যা কিছু ছিল অবিনশ্বর, তার মধ্যে যা কিছু ছিল নিত্যকালের সম্পদ, তার মধ্যে যা কিছু ছিল অমৃতের, আলোর আনন্দের নিত্য পাথেয়।

একটা ক্ষণকে, একটী লগ্নকে, একটী যুগকে তিনি সম্প্রসারিত করে দিয়ে গেলেন অনাগত বহু আগামী যুগে।

তাই যখন শুনি নোয়াখালীর গ্রাম-পথের অন্ধকারে, পুঞ্জীভূত নৈরাশ্য আর মৃত্যু-ভয়ের মধ্যে একক যাত্রী মহাত্মাজীর কণ্ঠে 'একলা চলরে,' তখন বুঝতে পারি সেদিনকার প্রাণের সৃষ্টি যেন আজকের দিনের জন্যেই অপেক্ষা করেছিল। উনিশ শ' পাঁচ কথা কয় উনিশ শ' সাতচল্লিশের সঙ্গে।

সেদিন বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত তার কাব্য সাহিত্যে যে নব-জাগরণ এসেছিল, তার একটা প্রধান লক্ষণ দেখতে পাই, উদগ্র জাতিয়তার দরুণ তার প্রকাশ শুধু বিদ্বেষ, বা আত্মসর্ব্বস্বতায় সীমাবদ্ধ নয়। বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর ভারত-অস্তিত্বের সুমহান আদর্শের প্রাণ-ধর্ম্মে তা দীপ্যমান্। বাংলা সেদিন জেগে উঠে নিজেকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছিল ভারতবর্ষকে,··· চিরন্তন ভারতবর্ষকে।

তাই দেখি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের মন চলেছে ভারত-বক্ষ-বাহিনী যমুনাকে অনুসরণ করে ভারত-ইতিহাসের অন্তরলোকে, গোবিন্দচন্দ্র দাস আহ্বান করছেন ভারত-ইতিহাসের পরম-পুরুষকে,

"আবার লইয়া রথ, উজলিয়ে এ ভারত
যদি হে আসিলে জগন্নাথ,
কিন্তু-কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ বনমালী,
কোথা সে অর্জ্জুন তব সাথ ?
এলে বটে পুনরপি, কোথা সেই ধ্বজ-কপি ?
শুনি না সে ভীষণ চীৎকার,
শত্রুর শোণিতমাখা কোথা সে রথের চাকা
মেদ-মজ্জা ক্লেদচিহ্ন যার ?
কোথা সেই শঙ্খরব, স্তিমিত স্তম্ভিত সব
দিগন্ত ভাঙ্গিয়া কই ছুটে ?
কোথা সে গাণ্ডীব ধনু লোহময় ভীমতনু
অর্জ্জুনের বজ্রকরপুটে ?"

হেমচন্দ্রের দীর্ঘশ্বাসে ফুটে উঠলো, বাংলা নয়, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। নবীনচন্দ্র আক্ষেপে বলে উঠলেন, এই নহে আর্য্যাবর্ত্ত, আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার। সত্যেন্দ্রনাথ (ঠাকুর) আহ্বান করলেন

বাঙালীকে নয়, মিলে সব ভারত সন্তান, গাও ভারতের যশোগান! বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্গীতকে বরণ করলেন, ভারতবাসীর পক্ষ থেকে, "এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু নর্ম্মদা-গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক। পূর্ব্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।" এমন কি বাংলার পল্লী-গায়কেরাও সেই উদার এক ভারতীয়তার সুরে গেয়ে উঠলেন গান··· রাইচরণ বিশ্বাসের,···

একবার জাগো, জাগো, জাগো,
যত ভারত-সন্তানরে
লোহিত বরণে পূরব গগনে
উদিত তরুণ তপন রে!

কিংবা দ্বিজশশীকান্তের,

"জাগো ভারতবাসীরে,
কত ঘুমে রবে রে",—

এইসব প্রাণ-থেকে ফুটে-ওঠা গানের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় এক-ভারতীয়তারই রূপ। বঙ্গ-ভঙ্গের খেদ থেকেই এই সব গানের উৎপত্তি কিন্তু তার মধ্যে বঙ্গ-ভঙ্গের বিশেষ কথা নেই, তার মধ্যে আছে স্পষ্টত ভারত-বেদনাই। বাংলা ভারতবর্ষ থেকে আলাদা করে নিজেকে দেখে নি। তার স্বদেশী আন্দোলন ভারত আন্দোলনেরই মূল ভিত্তি। আজ যদি বাঙালীকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীরা প্রাদেশিক বলে ভারতীয়ত্বের আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আসে তা হলে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ছাড়া তাকে আর কিছুই বলা চলে না।

উনিশ শ' পাঁচে বাঙালী প্রথম খুঁজে পায় ভারতবর্ষকে। তারপর

থেকে সে তার সর্ব্বশক্তি নিযুক্ত করে সেই খুঁজে-পাওয়া ভারতবর্ষকে, জানতে, বুঝতে।

তার সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন এই বৃহত্তর আন্দোলনেরই বাইরের প্রকাশ।

এই খোঁজার সাধনায় বাঙালীর পরম সৌভগ্য, তার ইতিহাসের পরম ভবিতব্যতা, প্রথমেই সে খুঁজে পায় তার মূল জীবন-সংহিতাকে…গীতাকে।

এই একখানি গ্রন্থের সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মিক ইতিহাস বিজড়িত। শতাব্দীর অন্ধকারে এই মহাগ্রন্থখানি হারিয়ে গিয়েছিল।

উনিশ শ' পাঁচে বাঙালী আবার তাকে খুঁজে বার করলো। তার পাঠোদ্ধার করতে সুরু করলো!

এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের পথ-প্রদর্শক।

এই অসামান্য প্রতিভাধর মহাপুরুষ বাংলা সাহিত্যের নব-কলেবর দান করার সঙ্গে সঙ্গে, অন্তরের অন্তরতম স্থল থেকে উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের জাতির, আমাদের ইতিহাসের, আমাদের সভ্যতার সমস্ত ব্যর্থতা আর অভাব। এবং উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই চরম-নিশ্চেষ্টতা আর পথ-হীনতার যুগে তাঁর অসামান্য প্রতিভাকে তিনি জাতির অন্ধকার জীবনের প্রতি কক্ষে প্রতিফলিত করেন…আপনার মহৎ উত্তরাধিকারের যোগ্যতায় যদি এই জাতিকে আবার জেগে উঠতে হয় তাহলে তার যে-যে মানসিক উপাদানের প্রয়োজন, তার প্রত্যেকটীর সন্ধান বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে যান। শুধু সাহিত্যে নয়, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের স্বাধিকারে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।

বিদেশী কুশিক্ষার ছদ্ম-আলোকে বিভ্রান্ত সেই যুগের অগ্রবর্ত্তী বাঙালীদের ক্রমিক আত্মঘাতের অভিশাপ থেকে রক্ষা করবার জন্যে, তাঁর ঋষি-দৃষ্টিতে সেই মহাক্ষতি নিবারণের দিব্যমন্ত্র স্বরূপ গীতাকে তিনি নতুন করে আবিষ্কার করলেন। যে ভাষায়, যে বৈদেশিক

চিন্তাপ্রণালীতে, যে নতুন আমদানী বৈজ্ঞানিকতা তখন বাঙালীর মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তারি সাহায্যে তিনি অগ্রবর্ত্তী বাঙালীদের কাছে নতুন করে গীতার ব্যাখ্যা করলেন।

তার সার্থকতা সেইদিনই বাঙালা যে বুঝতে পেরেছিল, তা নয়।

তার সার্থকতার বীজ অঙ্কুরিত হতে কিছু সময় লাগে। সে সময় এলো উনিশ শ' পাঁচে।

নব-জাগ্রত তরুণ বাঙালী সেই তার সভ্যতার আত্মিক সহচর মহাগ্রন্থের মধ্যে পেলো তার প্রয়োজনীয় শক্তির সন্ধান···চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত নৈরাশ্যের মধ্যে সেই গ্রন্থের শ্লোকে দেখতে পেলো বিজয়ের অমর আশ্বাস। কবে সে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে যুদ্ধ-বিমুখ অর্জ্জুনকে ক্ষত্র-যুদ্ধে প্রণোদিত করে শ্রীকৃষ্ণ শক্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ব্যবধানে সেই মন্ত্র তেমনি সজীবভাবে সেদিনকার তরুণ বাঙালীদের মনে একান্ত প্রয়োজনীয় শক্তির আশ্বাস এনে দিল। সেদিনকার তরুণ বাঙালী তার নিজের মতন করে তার প্রত্যক্ষ জীবনে গীতার নব-ব্যাখ্যা রচনা করলো।

এই একখানি গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে তার সঙ্গে তার সুবৃহৎ ইতিহাসের ধারাবাহিকতার প্রাণ-সংযোগ হয়ে গেল। কোন মানুষী শক্তির আয়োজনে এই সংযোগ সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক তরুণ বিপ্লবী তার হাতের অস্ত্রে অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের অমিত-তেজ অনুভব করবার সুযোগ পেলো।

উনিশ শ' পাঁচে বাঙালীর এই যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সাধনা, তার চরম বিকাশ ঘটলো···শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে···

এবং এখনও অব্যাহত চলেছে সে সুবিপুল সাধনার ঐকান্তিকতা···

সেদিন তাঁর বহু সহযাত্রীদের মতন শ্রীঅরবিন্দও এই গীতাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন···

সেদিনকার তাঁর সহযাত্রীরা গীতার মধ্যে যা পেয়েছিল, তিনি

অবশ্য আবিষ্কার করে তার ভেতর থেকে বৃহত্তর মহত্তর ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পেলেন…

কেউ দূর থেকে মন্দিরের চূড়া দেখে প্রণাম করে চলে গেল, কেউ তার দ্বার প্রান্তে লুটিয়ে পড়ে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করলো, কেউ বা তার চত্বরে প্রবেশ করে প্রণাম নিবেদন করলো, শ্রীঅরবিন্দ প্রবেশ করলেন বিগ্রহের ঘরে, কথা বল্লেন বিগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সঙ্গে।

সৌভাগ্যের বিষয়, ঠিক সেই সময়, ভারতবর্ষের মধ্যে, আর এক মস্তিষ্কশালী বীরজাতির মধ্যে, আর এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনিও নিজেকে খুঁজে বার করতে গিয়ে সন্ধান পেলেন এই গীতার, মারাঠার বালগঙ্গাধর তিলক ভারত-আন্দোলনের অন্যতম বীর সেনা-নায়ক।

বাঙালী আর মারাঠা, তাদের পেছনকার সম্পর্কের গ্লানি মুছে ফেলে, ভারত ইতিহাসের এক মহা-ভুলের অধ্যায়কে সংশোধন করে সেদিন পরস্পরকে চিনলো নতুন করে।

পরস্পরকে জানবার এই নতুন আনন্দের স্পন্দনকে বাঙালী চাইলো তার জাতীয় জীবনে চিহ্নিত করে রাখতে। তারা অনুসন্ধান করতে লাগলো এক যোগ্য পুরোহিতের, যিনি ভারত ইতিহাসের এই দুই দুরন্ত শক্তিকে একসূত্রে বাঁধতে পারেন।

তাই উনিশ শ' পাঁচের শুভ্র আলোকে বাঙালী আহ্বান করে নিয়ে এলো এই অরণ্যবনচারী বীর মারাঠাকে তার জাতীয় উৎসবের প্রাঙ্গণে।

বাঙালী নিষ্ঠা সহকারে, ধূপ জ্বেলে ধূনো জ্বেলে মঙ্গলবাদ্যের সঙ্গে করলো শিবাজী উৎসব।

এই উৎসবের অগ্রদূত হলেন একজন মারাঠী, যিনি বাংলাকে ভালবেসে বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন, সখারাম গণেশ দেউস্কর।

পুরাতন হিতবাদীর পাতায় এই মারাঠী দিনের পরদিন বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনের ইন্ধন জুগিয়ে গিয়েছিলেন।

পান্থীর সুবিখ্যাত মাঠে শিবাজী উৎসবের মেলা বসে। এই উৎসবকে প্রাণ-মণ্ডিত করলেন বাংলার কবি রবিন্দ্রনাথ। বাঙালীর প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি আহ্বান করলেন শিবাজীর আত্মাকে··আহ্বান করলেন প্রদেশহীন এক-ভারতীয়তার প্রাঙ্গণে।

এই উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে সখারাম লিখলেন, শিবাজীর দীক্ষা। সেই ঐতিহাসিক পুস্তিকার ভূমিকাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, তাঁর অমর কবিতা, শিবাজী।

শিবাজীকে কেন্দ্র করে কবি রচনা করলেন, আগামীকালের এক-ভারতীয়তার বীজমন্ত্র···

"মারাঠার সাথে আজি, হে বাঙালী, এক কণ্ঠে বল
জয়তু শিবাজী!
মারাঠার সাথে আজি, হে বাঙালী, এক সঙ্গে চল
মহোৎসবে আজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটী গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ কবি তাঁর অমর ভাষায় সংক্ষেপে রূপ দিয়ে গেলেন, একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটী গৌরব, এক পুণ্য নামে!

এই নতুন প্রাণের জোয়ারকে বাঙালী টেনে নিয়ে এলো তার রঙ্গমঞ্চে।

বিদেশী শাসকের সিডিশন্ আইনকে সামনে রেখে, বাঙালীর প্রতিভা অতীতকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলো বর্ত্তমানের দেহে, অতীতের মুখ দিয়ে কথা বলালো বর্ত্তমানকে।

আজকে কার স্মরণে আছে, সেদিনকার রঙ্গমঞ্চের একটী দিনের অপরূপ একটা মুহূর্ত্তের কাহিনী ?

মিনার্ভা রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহে সেদিন গিরীশচন্দ্র আমন্ত্রিত করে নিয়ে এসেছেন তিলক মহারাজকে। অভিনয় হচ্ছে, তাঁরই লেখা মীরকাশিম। তিনি নিজে নেমেছেন করিম চাচার ভূমিকায়। এই করিম চাচার ছদ্মরূপের ভেতর দিয়ে সেদিন কৌশলে গিরিশচন্দ্র তাঁর অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করলেন তিলক মহারাজকে, "আপনার দেশবাসী বর্গীদের অত্যাচারে একদিন বাংলা জর্জ্জরিত হইয়াছিল বলিয়াই এদেশে ইংরাজের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল...আজ তাই মনে হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনি যেন দেবদূতের মত বাংলার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া বাংলার এই বিপদ-সমুদ্রে কাণ্ডারী হইয়াছেন !"

তিলক সে ইঙ্গিত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন।

সেদিনকার তরুণ বাঙালী গীতার সন্ধান পেলো। গীতা তাকে শক্তির সন্ধান দিলো।

তরুণ বাঙালী শক্তির জন্যে লালায়িত হয়ে উঠলো।

দেহের শক্তি, মনের শক্তি, চরিত্রের শক্তি !

তরুণ বাঙালী চরম একনিষ্ঠভাবে দেহের শক্তির অনুশীলনে মেতে উঠলো। সেই সঙ্গে বুঝলো, দেহের শক্তি নির্ভর করে চরিত্রের শক্তির ওপর। তার চোখের সামনে তখন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলো বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মূর্ত্তি। তরুণ বাঙালী বুঝলো, জীবনকে ভোগ করবার জন্যেই চাই জীবনের সংরক্ষণ। চাই ব্রহ্মচর্য্য।

প্রত্যেক বিন্দু শক্তির আজ প্রয়োজন দেশের। তাই চরম নিষ্ঠায় সংরক্ষণ করতে হবে সেই প্রাণ-বিন্দুকে। উনিশ শ' পাঁচের তরুণ বাঙালী বিপ্লবীর জীবনের মূলভিত্তি হলো, ব্রহ্মচর্য্য। সেদিনকার তরুণ বাঙালী চরিত্রের শুচিতাকে জীবনের পবিত্রতম সম্পদের মতন বরণ করে নিয়েছিল। তাই সে তার ক্ষণ-অস্তিত্বকে অপূর্ব্ব দৈব-শক্তিতে বিমণ্ডিত করে তুলতে পেরেছিল। তাই সে তার সামান্য আয়োজন দিয়ে হিমালয়-প্রমাণ বাধাকে টলাতে পেরেছিল। তার সমস্ত কীর্ত্তি যদি হিসেব করে গোণা যায়, তাহলে দেখা যাবে, মাত্র গুটীকতক বোমা, আর খান ছ'য়েক পুরাণো রিভলভার, কিন্তু সেই অল্প আয়োজনের মধ্যে যা ছিল বিরাট, যা ছিল অপ্রমেয়, যা দোলা দিল কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর পর্য্যন্ত এই বিশাল ঘুমন্ত মহাদেশকে, তা হলো তার চরিত্র, তার মৃত্যুঞ্জয়ী শুভ্র শুচি বলিষ্ঠতা।

হে আমার তরুণ সহযাত্রী, জীবনে উদ্বোধন কর সেই শুভ্র শুচি বলিষ্ঠতাকে···সেই তোমার ন্যায্য উত্তরাধিকার।

দিকে দিকে, গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠতে থাকে অনুশীলন-সমিতি।

অনুশীলন কথাটার এই প্রয়োগবিধি বঙ্কিমচন্দ্রেরই দান।

বাঙালীর ছেলে, আখড়া ক'রে কুস্তি করে, লাঠি খেলা শেখে, ডন বৈঠক করে। খেলার পর সমিতির নায়কের মুখে গীতা-পাঠ শোনে।

বিদেশী শাসকের আপত্তি করবার কিছু থাকে না।

কিন্তু নিঃশব্দে লোক-চক্ষুর অন্তরালে এই সব সমিতির আড়ালে সৃষ্ট হয় দ্বিতীয় এক সমিতি···গুপ্ত-সমিতি। বাইরের সমিতি হলো পরীক্ষা-ক্ষেত্র। সেই পরীক্ষা-ক্ষেত্রে নানাভাবে ছেলেদের পরীক্ষা করে দেখা হয়, তারা সত্যিই ভয়শূন্য হয়েছে কি না, তারা জিতেন্দ্রিয় কি না, তারা নায়কের আজ্ঞা বিনা-প্রশ্নে মানতে প্রস্তুত হয়েছে কি

না। তারপরে তাদের ভেতর থেকে বেছে বিশেষ বিশেষ ছেলেকে অন্তরঙ্গ সমিতিতে নেওয়া হয়।

এই অন্তরঙ্গ সমিতিতে স্থান পেতে হলে, তাকে রীতিমত আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা নিতে হয়। এই দীক্ষার মন্ত্র আছে, গুরু আছে, শপথ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার আনন্দমঠের জীবন্ত সংস্করণ।

প্রত্যেক গুপ্ত-সমিতির গোপন-মন্দির কক্ষে বিরাজ করছেন, দেশজননী, রুধির-রসনা কপালিনী খড়্গধারিণী শবাসনা শ্যামা জননীর রূপে।

মেদিনীপুরে সরকারী স্কুলের শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসু শহরের ছেলেদের স্বাস্থ্য-চর্চার জন্যে গড়ে তুলেছেন, এমনি একটী অনুশীলন-সমিতি।

সেখানে চলে কুস্তী, ডন, বৈঠক, লাঠি-খেলা, হা-ডু-ডু···সন্ধ্যার পর ছেলেরা সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে শোনে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, গ্যারিবল্‌ডী-ম্যাটসিনির কাহিনী···শোনে গীতার শ্লোক··· ততো উত্তিষ্ঠস্ব যশোলভস্ব···

সত্যেন্দ্রনাথ মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন ছাত্রদের, তাঁর দুই চোখ যেন সর্ব্বদাই জেগে ছাত্রদের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে কি যেন···

একটী ছাত্র বিশেষভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বারো বৎসরের কিশোর বালক! ক্ষুদিরাম।

স্কুলে প্রত্যেক শিক্ষক তার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে গিয়েছেন, ওর লেখাপড়া কিছুই হবে না, একেবারে অপদার্থ!

সত্যেন্দ্রনাথের সন্ধানী চোখ কিন্তু অপদার্থ পরিত্যক্ত জিনিসের দিকেই বেশী আকৃষ্ট হয়।

তিরস্কার, প্রহার, উপবাস কিছুতেই সেই দুর্দ্দান্ত ছেলেকে সায়েস্তা করা সম্ভব হয় নি।

তার ভগ্নীপতি এবং দিদি নানাভাবে তাকে শাস্তি দিয়েছে। ক্রমশ শাস্তিই তার অভ্যস্ত হয়ে এসেছে।

তারই মতন দুরন্ত একদল ছেলে নিয়ে গাছে গাছে হৈ হৈ করে বেড়ায়, কার গাছে ফল পাকছে, কার পুকুরে মাছ হয়েছে তার সন্ধানে।

যখন সে জন্মগ্রহণ করে, তখন তার মা যমরাজকে ফাঁকি দেবার জন্যে সদ্য-জাত ছেলেটাকে তিন মুঠী ক্ষুদের বিনিময়ে বিক্রী করে দেন। তার কারণ, এর আগে, তাঁর দু-দুটী ছেলে জন্মেই মারা গিয়েছে। হয়ত যমরাজের তাঁর ওপর বিশেষ কোন আক্রোশ আছে, তাই তিনি এবার স্থির করেন, পুত্র জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্বত্ব তিনি বেচে দেবেন; এই ভাবে যমরাজকে ঠকাবেন। সেইজন্যই ছেলের নাম হয় ক্ষুদিরাম।

তিন মুঠো ক্ষুদের ফাঁকিতে সত্যসত্যই সেদিন যমরাজ প্রতারিত হয়েছিলেন কি না, তা বলা বড়ই কঠিন কিন্তু আঁতুড়ে মারা যাবার দুর্ভাগ্য ছাড়িয়ে উঠলো শিশু। কিন্তু যমরাজ আর একদিক থেকে শিশুকে ঘোরতর ভাবে আঘাত করলেন। তার মা ও বাপ দুইজনকেই টেনে নিয়ে তিনি শিশুটিকে অনাথ করে রেখে দিলেন।

নানারকমের লাঞ্ছনার ভেতর থেকে বালক ক্ষুদিরাম অবশেষে তার দিদির আশ্রয়ে এসে পড়ে কিন্তু বালকের ভাগ্যের দোষে সে-আশ্রয় বালকের নির্য্যাতনালয় হয়ে ওঠে। বাসী পান্তা-ভাত আর উপবাস বালকের ভাগ্যে প্রায়ই লেগে থাকতো।

সেই স্নেহ-হীন পৃথিবীর মধ্যে বালক একটা স্নেহের নীড় খুঁজে নিয়েছিল। তাদের পল্লীর একপ্রান্তে থাকতো ভাগ্যহতা সমাজ-পরিত্যক্তা এক তরুণী। ক্ষুদিরাম তাকে দিদি বলে ডাকতো। সেই তরুণীও নিজের ভাইএর মতন বালককে স্নেহ করতো।

কিন্তু বালকের ভগ্নীপতি সে-কথা জানতে পেরে, বালককে কড়া

নিষেধ জানিয়ে দিলেন, সেই মেয়েটীর বাড়ীতে যেন সে পদার্পণ না করে।

বালক সে-নিষেধ মানবার কোন প্রয়োজনই বোধ করলো না।

অবশেষে একদিন বালক হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল। ভগ্নীপতি রেগে বালকের খাবার বন্ধ করে দিলেন। এবং শাসালেন, এবার বাড়ী থেকে দূর করে দেবেন।

বালক অভিমানে নিজেই বাড়ী থেকে দূর হয়ে গেল।

কাঁসাইএর অপর পারে ঘন জঙ্গলে ছিল বুড়ো শিবের ভাঙ্গা মন্দির।

বালক শুনেছিল, যে কেউ বুড়ো শিবের কাছে আন্তরিক ভাবে ধন্না দিতে পারে, বুড়ো শিব তার মনস্কামনা পুর্ণ করে।

বালক স্থির করে, সে বুড়ো শিবের কাছে ধন্না দেবে। কি তার মনস্কামনা? দেশের কাজে সে তার জীবন উৎসর্গ করবে···এ জীবন নিয়ে তার চেয়ে ভাল সে আর কি করতে পারে?

একমাত্র তার পাতানো দিদির কাছে তার মনের সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে গোপনে সে কাঁসাই নদীর অপর পারের দিকে যাত্রা করে।

কাঁসাই নদীর ধারে গভীর জঙ্গল।

সে-জঙ্গলের ভেতর বুড়োশিবের মন্দির।

মন্দিরের ভাঙ্গা চত্বরে মৃতপ্রায় অসাড় ক্ষুদিরাম শুয়ে আছে!

আজ দু'দিন হতে চল্লো, সে এই ভাবে শুয়ে আছে!

ভগ্নীপতির সঙ্গে মাষ্টার সত্যেন্দ্রনাথের দেখা হয়, কথা হয়, ক্ষুদিরাম সম্পর্কে।

ভগ্নীপতি হতাশ হয়ে জানান, ও ছেলেকে দিয়ে কিছু হবে না! অপদার্থ!

সত্যেন্দ্রবাবু কিন্তু বলেন, আমার ধারণা ঠিক তা নয়! আজ দুষ্টু ছেলেদেরই বেশী দরকার!

ভগ্নীপতির কাছে সত্যেনবাবু জানতে পারেন, আজ তিনদিন সে বাড়ী ছাড়া!

—কোথায় গিয়েছে, খবর নেন নি?

—হাঁ, পাড়ায় খবর নিয়েছি···এখানে কোথাও নেই···ঐ বাড়ীর মেয়েটা না কি বলেছে, বুড়োশিবের মন্দিরে গিয়েছে!

—কেন, সেখানে কি?

—কে জানে? আপনিও যেমন, বিশ্বাস করছেন কথা···নিশ্চয়ই ঐ মেয়েটার বাড়ীতে লুকিয়ে আছে···ঐ মেয়েটাই তো ওর মাথা খেয়েছে!

সত্যেনবাবু গম্ভীর হয়ে ভাবেন!

মেদিনীপুর আত্মোন্নতি সমিতি।

একটা কাঠের ওপর খড়ি দিয়ে লেখা।

লতার বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা ছোট মাঠ—তার ভেতর একটা খড়ের ছাউনী ঘর। সত্যেন্দ্রনাথের অনুশীলন সমিতি।

একদল ছেলে লাঠিখেলা শিখছে।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রবেশ করেন।

তাঁকে দেখে ছাত্ররা অভিবাদন জানায়, বন্দেমাতরম্।

সত্যেন্দ্রনাথ উত্তর দেন, বন্দেমাতরম্!

দলের মধ্যে থেকে তিনি একজনকে ডাকেন, বীরু!

বীরুকে নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢোকেন।

দরজা বন্ধ করে দেন।

—নতুন ছেলেদের মধ্যে কাউকে পেলে?

—দুটো মনে হয় রাজী!

—পরীক্ষা করে দেখেছ?

—হাঁ···

—ভেতরকার কথা তাদের কাছে কিছু ভেঙেছ?

—না, আপনাকে না জিজ্ঞাসা করে তা কি পারি?

—কলকাতায় দু'জন কর্ম্মী পাঠাতে হবে···

—ওদের দুজনকেই তৈরী করে পাঠান যায়।

—শপথ দেওয়া চলে তাহলে?

—হাঁ···

—বেশ, তা'হলে সামনের অমাবস্যায়—ওদের দুজনকে দীক্ষা দেবো, সেই সঙ্গে আর একটা ছেলেকেও ধরবার চেষ্টায় আছি··· একসঙ্গে তিনজনকেই দীক্ষা দেবো।

—তৃতীয় ছেলেটা কে?

—এখন বলবো না···তাকে আনতে যাচ্ছি···আমি না ফেরা পর্য্যন্ত হুঁসিয়ার থেকো।

—কতদূর যাচ্ছেন জানতে পারি কি?

—বেশী দূর নয়···কাঁসাই-এর জঙ্গলে···বুড়োশিবতলায়—

কাঁসাই-এর জঙ্গলে বুড়োশিবতলা।

ক্ষুদিরাম তেমনি সাপটে শুয়ে আছে।

মাঝে মাঝে ক্ষীণ শব্দ শোনা যাচ্ছে···

—শিব হে··শিব হে···

পাশ দিয়ে শেয়াল চলে যায়···

একটা সাপ পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ নিঃশব্দে প্রবেশ করেন, ধীরে ক্ষুদিরামের মাথার শিয়রের কাছে গিয়া দাঁড়ান।

অস্ফুট শব্দ শোনা যায়,—

—শিব হে…

সত্যেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বলেন,…

—আমি এসেছি…কি চাও?

ক্ষুদিরাম ধড়মড় করে উঠে বসে বলে..

—বাংলার স্বাধীনতা!

তারপর মাষ্টার মশাইকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলে,—

—আপনি…মাস্টার মশাই?

—হাঁ…আমি…

তিনদিন অনশনক্লান্ত দেহ নিয়ে ক্ষুদিরাম দাঁড়াতে আর পারছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথ তাকে ধরে কাছে নিয়ে একটা ভাঙ্গা পাথরের ওপর বসান।

—কে তোকে বুড়ো শিবের কাছে ধন্না দিতে পাঠালো?

—আমি নিজেই এসেছি।

—দেশকে সত্যি ভালবাসিস্?

—তার চেয়েও আর কিছু ভালবাসি না।

—তার জন্যে মরতে পারিস্?

নিশ্চয়ই!

—তার জন্যে সকলকে কিন্তু ছাড়তে হবে!

—ভগবান তো আমাকে অনাথ করেই পাঠিয়েছেন মাষ্টার মশাই!

—আচ্ছা, আর একটা কথা…তার আগে, এই নে…মুখে দে… তিনদিন কিছু খাস্‌নি…

ক্ষুদিরাম লেবুটা নিয়ে ছাড়িয়ে খায়।

—বলুন!

—তুই যে ঐ মেয়েটার বাড়ীতে যাস্…ও মেয়েটা তোর কে?

—আমার মায়ের পেটের দিদির মতন!

—সত্যি!

—এই বুড়োশিবের মন্দিরে দাঁড়িয়ে বলছি, সত্যি!

—আচ্ছা···তাহলে আজ থেকে তুই সংসার ছেড়ে আমার কাছে দীক্ষা নিবি?

—আপনি? আপনি···মাষ্টার মশাই···

—হাঁ··আমি···আজ থেকে যা জানবে, যা শুনবে, তা আর জগতে কাউকে জানাতে পারবে না···

—আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম!

—বেশ, চল এখন···

তাঁরা দুজনে মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

বনের ধারে একটা পোড়া বাড়ীর ভিতর···

একটা অন্ধকার ঘর···

অন্ধকারে কে একজন মশাল জ্বালিয়ে ধরলো···

ঘর আলোকিত হয়ে উঠলো।

সে-আলোকে দেখা গেল খর্পরধারিণী কালীমূর্ত্তি···

মশাল হাতে সমিতির একটী ছেলে মুর্ত্তির পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে—

মুর্ত্তির সামনে ধ্যানরত সত্যেন্দ্রনাথ···

ধ্যান অন্তে সত্যেন্দ্রনাথ দেবীকে প্রণাম করে বলেন,···

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে অনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে
ত্বমেক গতির্দেবী নিস্তারহেতু র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

—দীক্ষাগ্রহীদের নিয়ে এসো!

মশালধারী তিনটী যুবককে নিয়ে আসে।

তাদের মধ্যে একজন ক্ষুদিরাম।

—তোমরা দীক্ষা নিতে প্রস্তুত?

—প্রস্তুত!

—সমিতির সমস্ত নিয়মাবলী তোমরা পড়েছ?

—হাঁ।

—তাতে স্বাক্ষর করেছ?

—হাঁ।

—তাহলে দেবী কালিকার সামনে এখন তোমাদের বিশেষ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে···দেবীর সামনে বামজানু মাটীতে ঠেকিয়ে প্রত্যালিঢ় মুদ্রাতে উপবেশন কর···

তারা তাই করে···

সত্যেন্দ্রনাথ তাদের মাথায় তরবারি আর গীতা স্থাপন করেন,···

বল, ভগবান, যজ্ঞাগ্নি, এই দেবী কালিকা আর দীক্ষা গুরুর নামে তোমরা শপথ গ্রহণ করছো, যতদিন না তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয়, ততদিন গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে··

—পালন করবো···

—আজ থেকে পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, গুরুর আদেশে পরিত্যাগ করবে···

—পরিত্যাগ করবো···

—প্রয়োজন হলে গুরুর আদেশে বিনা প্রশ্নে প্রাণত্যাগ করতে হবে···

—করবো।

—জীবন দিয়েও মন্ত্রগুপ্তি সাধন করতে হবে···

—করবো···

—যদি ঘৃণাক্ষরে সমিতির কোন নিয়ম লঙ্ঘন কর, তাহলে দলের নেতার কাছ থেকে মৃত্যুদণ্ড নিতে হবে।

—নেবো…

—তিনটী বিল্বপত্র তুলে নাও!

তারা তাই করে।

—এই অস্ত্র দিয়ে নিজের হাতে বুকের রক্ত বার করো।

তারা তাই করে।

—এই রক্তে বিল্বপত্রগুলো ভাল করে ভিজিয়ে নাও!

তাই তারা নেয়।

—দেবীর চরণে উৎসর্গ করো, বলো, বন্দেমাতরম্!

—বন্দেমাতরম্!

দীক্ষার পর ক্ষুদিরাম সমিতিতে লাঠীখেলা শিখতে লাগলো।

রহিম বলে এক ওস্তাদ জেঠেল, একদিন এক হাঙ্গামার সময় একা দশ পনের জনের মহড়া নিলো।

সত্যেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং কৌশলে তাঁর জাল বিস্তার করে রহিমকে আড্ডায় নিয়ে এলেন।

ক্ষুদিরাম রহিমের কাছ থেকে লাঠী আর ছোরাখেলার ওস্তাদ হয়ে উঠলো।

তখন সারাদেশের মধ্যে বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষ্য করে তুমুল স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়ে গিয়েছে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকের দল রাস্তায় টহল দিয়ে ফেরে।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেনা ভাই!

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন কর! ইত্যাদি।

মেদিনীপুরে ক্ষুদিরাম তার চেলাচামুণ্ডা নিয়ে বিলিতী কাপড়ের দোকান পুড়িয়ে বেড়ায়।

পুলিশের নজরে পড়ে।

রাস্তায় পুলিশ ঢাড়া পিঠে দেয়, প্রকাশ্যে যে বন্দেমাতরম্ বলবে, অথবা কাপড় পোড়াবে তার কারাদণ্ড হবে।

সমিতির আখড়ায় দাঁড়িয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তার শিষ্যদের নিয়ে শোনেন।

এমন সময় সমিতিতে পুলিশ হানা দেয়,...

তন্ন তন্ন করে সার্চ্চ করে,...

যাবার সময় পুলিশ সত্যেন্দ্রকে জানিয়ে যায়, আপনি সরকারী স্কুলের মাষ্টার, আপনার এ সবের মধ্যে থাকা উচিত নয়!

সত্যেন্দ্র পুলিশেব কাছে স্বদেশীওয়ালাদের তীব্র নিন্দা করেন।

বলেন, এ সব মাথা গরম ছেলেদের সঙ্গে আমাকে এক করে দেখবেন না—আমরা চাই দেশের ছেলেরা স্বাস্থ্যবান্ হোক, তাই এই সব ব্যায়াম চর্চ্চার আয়োজন করছি—

—ঠিক, ঠিক—

—বিলিতী কাপড় পুড়িয়ে কি হবে? আমার উদ্দেশ্য হলো, যাতে ছেলেরা স্বদেশী সত্যিকারের হতে পারে, নিজেদের কাপড় নিজেরা বুনতে পারে—

—ঠিক, ঠিক...

—তাই তো, একটা তাঁতশাল করেছি সেখানে ছেলেদের কাপড় বুনতে শেখাই...

পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টর্ সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়। বলে যায়, সত্যেন্দ্র-বাবু, আপনি একটু নজর রাখবেন কিন্তু....

—সে আর বলতে হবে না।

সত্যেন্দ্রের তাঁতশালা।

সেই ভাঙ্গাবাড়ীর সামনে একটা উঠোনে একটা তাঁত পাতা আছে। তাঁতে সব সময় আধখানা কাপড় আধ-বোনা অবস্থায় থাকে—

বাইরে থেকে কেউ দেখতে এলে তখন একটা ছেলে সেই তাঁতে গিয়ে বসে।

কিন্তু আসলে তাঁতশালার পেছনে চলে, রিভলভার প্র্যাক্‌টিস্—

একটা ঘন বন বাড়ীর পেছনে, সেখানে দেখা গেল, ক্ষুদিরাম টারগেট প্রাকটীস্ করছে—

সেখানে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে আজ একজন নতুন লোককে দেখা গেল—হাফপ্যাণ্ট পরা—সত্যেন্দ্রের কথায় বোঝা গেল, তাঁর নাম হেমদা,—

জমিজমা যা ছিল সব ডিক্রী করে তিনি ফ্রান্সে গিয়েছিলেন, বোমা তৈরী করার পদ্ধতি শেখবার জন্যে এবং তিনি সেই সব শিখে ফিরে এসেছেন—

হেমদা ক্ষুদিরামকে সাবাস্ দেয়—বা…চমৎকার aim—

ক্ষুদিরাম ধরে বসে, আমাকে কিন্তু বোমা তৈরী করতে শিখিয়ে দিতে হবে—

এখন নয়…এখুন আমাকে কলকাতায় যেতে হবে—বারীন মুরারী পুকুরে তাদের বাগানবাড়ীতে একটা আড্ডা করেছে সেইখানেই গিয়ে বোমা তৈরী করবো—

—আমাকে নিয়ে চলো!

—সময় হলেই ডাক পড়বে।

মেদিনীপুর শিল্পপ্রদর্শনী, স্বদেশী বাজার বসেছে।

সাজানো গেটের ভেতর দিয়ে দলে দলে লোক চলেছে।

গেটের সামনে ভিড়ের মধ্যে ক্ষুদিরাম দাঁড়িয়ে একখানা পুস্তিকা বিলি করছে—

লোকে হুড়োহুড়ি করে নিচ্ছে···নিষিদ্ধ পুস্তিকা এমন সময় একজন পুলিশের নজর সেই দিকে পড়লো। পুলিশ এগিয়ে এসে ক্ষুদিরামকে ধরে ফেল্লো।

—এইবার ধরেছি শয়তান! ক্ষুদিরাম ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি করে···এমন সময় সত্যেন্দ্রনাথ এসে পড়েন।

পাহারওয়ালা তাঁকে দেখে বলে, এই দেখুন মাষ্টারমশাই, ধরেছি···

সত্যেন্দ্রনাথ বলে ওঠেন, আরে করেছ কি, এ যে ডেপুটিবাবুর ছেলে!

ডেপুটির নাম শুনে পাহারাওয়ালা আঁতকে উঠে তৎক্ষণাৎ হাত ছেড়ে দেয়।

—এঁ্যা···বলেন কি মাষ্টারমশাই!

ক্ষুদিরাম সেই অবসরে ছাড়া পেয়েই ছুটে পালায়।

লোকে ব্যাপারটা বুঝতে পরে হেসে ওঠে। বলে,—ওঃ ডেপুটী নামের কি মহিমা রে!

লোককে হাসতে দেখে পাহারাওয়ালার চৈতন্যোদয় হয়।

সে বুঝতে পারে, মাষ্টারমশাই ধাপ্পা দিয়েছে—কিন্তু পাখী তখন পালিয়েছে—

ধরবার জন্যে তাড়াতাড়ি ছোটে। কিন্তু ক্ষুদিরাম তখন কোথায়?

পাহারওয়ালা থানায় গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নালিশ করলো। তাঁকে অবিলম্বে থানায় ধরে নিয়ে আসা হলো। ইন্‌স্‌পেক্‌টর্‌ ধমক দেয়, আপনি কেন মিথ্যে কথা বলেছেন?

সত্যেন্দ্রনাথ বলেন, আমার ধারণা তাই ছিল!

—এ রকম ধারণা থাকা ভাল নয় মাষ্টারমশাই!

সত্যেন্দ্রনাথ থানা থেকে ফিরে এলেন বটে কিন্তু দুদিন পরেই দেখলেন, সরকারী আদেশে তাঁর চাকরী খতম হয়ে গিয়েছে।

সমিতির আড্ডায় রাত্রির অন্ধকারে সকলে নীরবে বসে।

সত্যেন্দ্রনাথ বিমর্ষ।

অর্থের একান্ত অভাব। তার ওপর চাকরী গেল।

সত্যেন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করেন, অথচ আমাদের দেশে মহাজনের ঘরে টাকায় শ্যাওলা পড়ছে—

ক্ষুদিরাম সে-ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝতে পারে। অন্ধকারে ভূতের মতন চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারপর কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ে।

অন্ধকারে ভাঙ্গাবাড়ীর কালী মন্দিরে প্রবেশ করে।

প্রদীপ জ্বেলে মাকে প্রণাম করে।

তারপর বেরিয়ে পড়ে।

যেন কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে সে চলেছে।

ঘন্টি বাজাতে বাজাতে সরকারী ডাকহরকরা চলেছে। সে জানে না, তাকে অনুসরণ করে একজন চলেছে।

পথের এক বাঁকে ক্ষুদিরাম এক গাছের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ডাক হরকরার সঙ্গে গাঁয়ের একজন লোকের দেখা হলো। লোকটার হাতে হুঁকো।

—আরে মোড়ল যে! কত দূর।

শহরে···

—এক ছিলিম হবে নাকি ?

—তা দাঁড়িয়ে একটান দিয়ে নি, দাও, কাল মাসপয়লা—আজ ক্যাস পঁউছিতেই হবে···

একটান টেনে ডাক হরকরা সরকারী ক্যাস নিয়ে চলতে আরম্ভ করে আবার।

ক্ষুদিরাম গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে, সামনে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অন্য পথ দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে। এক নির্জ্জন পথের বাঁকে।

ক্ষুদিরাম আগিয়ে এসে গাছের আড়ালে দাঁড়ায়।

দেখে-ডাক হরকরা এগিয়ে আসছে। একটা কালো ঢাকনা দিয়ে ক্ষুদিরাম মুখটা ঢেকে নেয়।

ডাক-হরকরা পথের বাঁকে আসতেই ক্ষুদিরাম সামনে রিভলভার উঁচিয়ে বলে উঠে···হুঁসিয়ার।

ভয়ে হরকরা ব্যাগ ফেলে, চীৎকার করে ওঠে এবং ভয়ে পথে শুয়ে পড়ে।

ক্ষুদিরাম ব্যাগ তুলে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে।

হাঁফাতে হাঁফাতে ক্ষুদিরাম সমিতিতে এসে উপস্থিত হয়,···

সত্যেনের পায়ের কাছে ব্যাগটা রেখে দেয়।

সত্যেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন, কত আছে ?

—দেখিনি তো !

—কিন্তু তোমার আর তো এখানে ঘুরে বেড়ানো চলবে না··· এখনি গা-ঢাকা দিতে হবে···

—যা বলবেন, তাই করবো···

—কলকাতা যাবার জন্যে প্রস্তুত হও !

সেই সময় মেদিনীপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে কলকাতা থেকে এলেন জন-নেতারা। তাঁদের সঙ্গে এলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। কলকাতার বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির নায়ক।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ক্ষুদিরামের।

জহুরী যেমন সাচ্চা মুক্তোর সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, বারীন্দ্রকুমার তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সাচ্চা ছেলের সন্ধানে। বিবেকানন্দের ভাষায়, যারা সজ্ঞানে তাদের জীবন মায়ের কাছে বলি দিয়েছে···জন্ম থেকে মাতৃ-চরণে বলি-প্রদত্ত।

ক্ষুদিরামকে দেখে বারীন্দ্রকুমার চিনতে পারেন, সাচ্চা মুক্তো বলে। নিজের কাছে টেনে নেন্। কলকাতায় তাঁদের আড্ডায় আসবার সমস্ত বন্দোবস্ত করেন।

ক্ষুদিরাম পুলিশের নজর এড়িয়ে মেদিনীপুর ত্যাগ করে।

কলকাতার রাস্তা, হ'কারের হাতে, দেখা যাচ্ছে, সন্ধ্যা আর যুগান্তর কাগজ···

হকার হাঁকছে,···

—আজকে সন্ধ্যেয় ভারি মজা
শাদা পাঁঠায় খাচ্ছে খাজা···

পথের ধারে বেঞ্চি পাতা চায়ের দোকান, ভাঁড়ে করে সাধারণ লোকে চা খাচ্ছে—

একজন সন্ধ্যা পড়ে শোনাচ্ছে—

আজ অমাবস্যা—কালী বাড়ীতে—

জোড়া পাঁঠা হবে বলি—একটা শাদা, একটা লাল—

মুদির দোকানের সামনে···

সন্ধ্যা কাগজ নিয়ে সবাই টানাটানি করছে!

—ভারী লিখেছে হে উপাধ্যায়।

—লোকটা কে বটে হে!

কেউ বলে খৃষ্টান, কেউ বলে ব্রাহ্ম···কেউ বলে, না রে আবার হয়েছে হিন্দু···মহাযোগী লোক—যোগের শক্তিতে ইংরেজদের কাৎ করে দেবে—

একজন তার মধ্যে থেকে একটা ভয়ানক জরুরী সংবাদ দেবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে, বলি, এখানে তো কেউ টিকটিকি নেই···

—না রে, না···

শোন্ তাহলে বলি, দাদা কেদারবদরী থেকে ফিরে এসেছে··· সেখানে দাদা শুনে এসেছে—হিমালয়ের মানস-সরোবরের তীর থেকে একদল নাগা সন্ন্যাসী আসছে···তারা যোগের বলে সমস্ত ফিরিঙ্গীকে···

অবশিষ্ট কথা কাণে কাণেই বলে।

একটা রহস্যময় শক্তির আবির্ভাবের নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা তখন লোকের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে।

আজকালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখছি, সেদিন সাধারণ লোকের মনে সহসা যোগের অলৌকিক শক্তি আর রহস্যময় এক আবির্ভাবের সম্ভাবনা সম্পর্কে যে-সব বিচিত্র ভাব আর ভাবনা ফুটে উঠেছিল, সেটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক অথবা অবাস্তব নয়। হিমালয়ের ভেতরে মানস-সরোবরের তীর থেকে অলৌকিক যোগ-শক্তি-সম্পন্ন কোন নাঙ্গা সন্ন্যাসীর দল অবশ্য আসেনি, কিন্তু ভারত-ইতিহাস তখন তার নিঃশব্দ ছন্দে একটী অপরূপ ব্যক্তিত্বকে তার আভ্যন্তরিক অভিব্যক্তি-ধারার স্রোতে আকর্ষণ করে নিয়ে আসছিল। এই বিরাট নিঃশব্দ আয়োজনের কথা বাইরের জগতে কেউই জানতো না, এমন কি যে-ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে ভারত-ইতিহাসের এই নব-অভিব্যক্তির

সূচনা হচ্ছিল, তিনিও সেদিন জানতেন না, কি মহা-পরিণামের দিকে তিনি অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন। সেই অভিনব ব্যক্তিত্বের নাম শ্রীঅরবিন্দ। উনিশ শ' পাঁচে যে মহাবীজ আমাদের জাতীয়-জীবনের ক্ষেত্রে উপ্ত হয়, তার আংশিক প্রকাশ আমরা দেখেছি, সেদিনকার রাজনৈতিক আন্দোলনে আর সাহিত্যিক জাগরণে কিন্তু তার চেয়ে মহত্তর এক সার্থকতা যে তার মধ্যে ছিল সেদিন তা আমাদের লক্ষ্যে পড়ে নি।

উনিশ শ' পাঁচে বাংলা দেশে যে নব-জাগরণ হয়, তার আংশিক সফলতা আজ আমরা দেখছি, আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে, কিন্তু এই প্রাপ্তি হলো সেই আন্দোলনের আংশিক প্রকাশ মাত্র। তার চেয়েও এক বৃহত্তর, মহত্তর সম্ভাবনার বীজ সেদিন এই আন্দোলনের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দ নিজের সাধনার মধ্যে বপন করেন, সে হলো, ভারত-চিত্তের পূর্ণ অভিব্যক্তি, ভারত-সাধনার পরিপূর্ণ বিকাশ, তার অর্থ হলো শুধু বাংলা বা ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি নয়, অরবিন্দের ব্যক্তিগত যোগ-বিভূতি লাভ নয়, তার অর্থ হলো সমগ্র মানবতার উন্নয়ন···বর্ত্তমানের এই খণ্ড জীবনের দৈন্য আর বেদনা থেকে সমগ্র মানুষকে এক নবতর উন্নততর দীপ্ততর জীবনের স্তরে উন্নীত করা, মানব-সভ্যতায় এক দিব্যতর চেতনার সৃষ্টি।

উনিশ শ' পাঁচ সেই বিরাট মানবীয় পরীক্ষারও সূচনা-ক্ষেত্র। তাই সে শুধু বাংলা বা ভারবর্ষের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, বিশ্বের দিন-পঞ্জীর সঙ্গে সংযুক্ত।

বাংলায় যখন জনসাধারণের চিত্তে জাগরণের একটা পূর্ব্ব-চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তখন বাংলা থেকে দূরে শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় বসে একনিষ্ঠ তপস্বীর মতন আত্মানুশীলনে মগ্ন ছিলেন। এই আত্মানুশীলনের পথে তখন তাঁর প্রধান সহায় ছিল তাঁর কাব্য-লক্ষ্মী। সে কাব্যের বাহন

হলো ইংরেজী ভাষা। কিন্তু তার অন্তর ছিল পৌরাণিক। তাঁর একান্ত সুপরিচিত গ্রীক আর প্রাচীন আর্য্য পুরাণের মধ্যে তাঁর কবি-মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অন্তরের পরম ধনের সন্ধানে। বাইরের জীবনের কোন কাম্য-বস্তু, ধন, জন, যশ, অর্থ, পদ বা পদবী কিছুই তাঁর মনকে আকর্ষণ করতে পারে নি। তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা আর মনীষা তাঁর মনকে গড়ে তুলেছিল বিশ্বতোমুখী করে, যেখানে হিব্রু পুরোহিতরা তাঁদের আদিম ভাষায় বিশ্বত্রাতার অপেক্ষায় আছে, যেখানে গ্রীক দেবতারা অলিম্পিয়াস্ পর্ব্বতের চূড়ায় আসা-যাওয়া করেন, যেখানে কেল্‌টিক মন তার প্রভাতী আলোক-স্বপ্নে মগ্ন, যেখানে আর্য্য ঋষিরা রচনা করছেন জীবনাতীতের প্রত্যক্ষ-অনুভূতির বেদ। সেখানে তিনি তাদের প্রত্যেকের স্বদেশবাসী, তাদের প্রত্যেকের ভাষার ও ভাবের অন্তঃপুরে পরমাত্মীয়ের মতন তিনি বিচরণ করেন। সেখানে তাঁর কবি-মন সন্ধান করে ফিরে, নিত্যকালের ছন্দে লেখা অনন্তের লীলা রূপ। সেখানকার প্রদোষালোকে তাঁর মনে জেগে ওঠে এক মহা-মুক্তি-দাতার স্বপ্ন। Perseus the Deliverer কাব্যে তিনি পার্সিউসের মধ্যে দেখেন মুক্তিদাতার পূর্ব্বাভাস। পৃথিবীর সমস্ত জীবন-ইতিহাসের মধ্যে তাঁর কবি-দৃষ্টিতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে দেবতা আর অসুরের নিত্য-সংগ্রামের লীলা। কোন বিশেষ দেশের, বা বিশেষকালের কথা নয়, সমগ্র মানবতার মধ্যে ওতপ্রোত যে ব্যর্থতা, তা তাঁর কবি-অন্তরকে স্পর্শ করে। যুগে যুগে মানুষ যে স্বর্গের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়েছে, যে মহা-সম্ভাবনার সঙ্গীত তার বিশাল যাত্রা-পথের বাঁকে বাঁকে অনুরণিত হয়ে উঠেছে, এবং তাকে নব-নব দুর্লভ সাধনায় প্রণোদিত করেছে, যার কথা জগতের মহা কবিরা নানা ভাবে নানা কাহিনীতে বারে বারে গেয়ে গিয়েছেন, কবি অরবিন্দের কাব্যে আবার তা দিব্য ভাষায় প্রকাশিত হয়ে উঠলো। রাজনীতির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে নামবার

আগেই তাঁর মনের সর্ব্বস্থল ব্যেপে জেগে ছিল, সেই দুর্লভ দুরাকাঙ্ক্ষা *পৃথিবী হবে স্বর্গরাজ্য, এই মৃত্যুশীল মানুষই আবার আয়ত্ত করবে* সমুদ্র-মন্থন ধন অমৃত, মানুষই হবে দেবতা। Savitri মহাকাব্যে যার পরিণতি, তার সূচনা সেইদিন হয় Perseus the Deliverer নাট্য-কাব্যে। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে Browning, Wordsworth যেখানে এসে থেমে গিয়েছিলেন, কবি অরবিন্দ সেখান থেকে সুরু করলেন নব-যাত্রা। এই ভারতীয় কবির মন ও প্রতিভার বিস্ময়কর দানে ইংরেজী ভাষা ও কাব্য এক ধাপ এগিয়ে এক নতুন আত্মিক সম্ভাবনার রাজ্যে সমুপস্থিত হলো। জাতিগত আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করে ইংলণ্ডের সমালোচকদের সেকথা একদিন স্বীকার করতেই হবে।

Pallas-এর মুখ দিয়ে সেদিন কবি-অরবিন্দ যেকথা বলিয়েছিলেন,

> "For through the shocks of difficulty and death.
> Man shall attain his Godhead."

আজ তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ সাধনা সেই অমর আশ্বাসের সুনিশ্চিত বাণীকেই জগতের সামনে তুলে ধরেছে।

এই নাট্যকাব্যের পরিসমাপ্তিতে কাসিওপিয়া আর পারসিউসের কথোপকথনে বর্ত্তমান বিশ্ব-সাহিত্যের লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন অস্থিরতার মধ্যে আত্মার যে ধ্রুব বাণীর পরমোজ্জ্বল প্রকাশ দেখতে পাই, সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবেও তা অতুলনীয়'…

Cassiopea. How can the immortal gods and Nature change?
Perseus. All alters in a world that is the same.
Man most must change who is a soul of Time;
His gods too change and live in larger light.
Cepheus. Then man too may arise to greater heights,
His being draw nearer to the gods?

Perseus. Perhaps.
But the blind nether forces still have power
And the ascent is slow and long is Time.
Yet shall truth grow and harmony increase.
The day shall come when men feel close and one.
Meanwhile one forward step is something gained,
Since little by little earth must open to heaven
Till her dim soul awakes in to the Light."

বিস্ময়ে শুনি, ঠিক এই জাতীয় পরিবেশের মধ্যে পরবর্ত্তী যুগে, মাহাত্মা গান্ধীর মুখে, তাঁর জীবন নীতির চরম প্রকাশ, তিনি অবশ্য আর এক ইংরাজ কবীর ভাষায় বলেছিলেন, One step forward is enough for me....

মাহাত্মাজী যদি সাহিত্যের পাঠক হতেন, তাহলে দেখতে পেতেন, তাঁর জন্যে তার স্বদেশবাসী কবিই লিখে রেখে গিয়েছেন, Mean while one forward step is something gained....

এই আর-এক-পা অগ্রসর হবার জন্যেই কবি অরবিন্দ নামলেন, তাঁর স্বদেশবাসীর রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে। বরোদার রাজ-সম্মান অর্থকরী পদ সমস্ত ত্যাগ করে চলে এলেন বাংলায়। বরোদার মহারাজা ভাবলেন, এটা হয়ত সাময়িক একটা অনুরাগের খেয়াল। লোক পাঠালেন, বাংলায়, বরোদায় তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু তিনি ভুল করেছিলেন অরবিন্দকে বুঝতে। ছেঁড়া মাদুরে, বোতাম খোলা সার্টে তিনি তখন বসেছেন, নতুন-জাগা তরুণের মনের খোরাক জোগাতে। নিজেকে, সেই সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে আর-এক-ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবার সাধনায়।

এদেশের মধ্যে যাঁরা জাগ্রত, শিক্ষিত, অরবিন্দ দেখলেন, তাঁরা ইংরেজ শাসনের পরিণাম সম্বন্ধে তখনো একান্ত ভ্রান্ত; জাতীয় কংগ্রেস তাঁদের তত্ত্বাবধানে বিদেশী-শাসকের একরকম পরামর্শ-

দাতার স্থান গ্রহণ করেছে, জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্যস্বরূপ স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। তাঁদের দ্বারা ভারতের মুক্তি হতে পারে না। পরাধীন জাতিকে নিজের চেষ্টায় মুক্তি অর্জ্জন করতে হবে এবং তার জন্যে প্রয়োজন,...

(১) কর্ত্তব্য ও আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান এবং

(২) রাজনৈতিক কর্ম্ম।

প্রথমটীর জন্যে নতুন সংবাদ-পত্রের প্রয়োজন, দ্বিতীয়টীর জন্যে বীর কর্ম্মীর প্রয়োজন। প্রথমটী বাধাসত্ত্বেও প্রকাশ্যে হতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়টি আপাতত গোপনেই করতে হবে। তাই প্রকাশ্যে তিনি লেখনী ধারণ করলেন এবং গোপনে বীর কর্ম্মীর দল নিয়ে গুপ্ত সমিতি গঠন করলেন।

শিক্ষার অভাবে এবং ইংরেজী শিক্ষার কু-প্রভাবে দেশের লোকের মন থেকে স্বধর্ম্মের ও স্বজাতির প্রকৃত গৌরবের রূপ তখন একরকম মুছে গিয়েছিল। ভারতবর্ষ কি, ভারতবর্ষ বলতে কি বোঝায়, ভারতের সাধনা কি, বিশ্ব-সভ্যতার ধারায় ভারত-সাধনার তাৎপর্য্য কি, অর্থৎ আমরা কি হারিয়েছি আর কি-ই বা উদ্ধার করতে চলেছি, সে-সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত মনেরও তখন কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ইংরেজ আমাদের বুঝিয়েছে, আমরা যা হারিয়েছি, তা' হচ্ছে একটা তামার ঘসা পয়সা মাত্র, সুতরাং তাকে ফিরে পাবার জন্যে কাঁদবার কোন প্রয়োজনই নেই...ইংরেজ তার পরিবর্ত্তে রীতিমত পাকা সোনার গিনি আমাদের হাতে তুলে ধরে দিচ্ছে, অতএব কৃতজ্ঞচিত্তে ইংরেজকে ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত।

শ্রীঅরবিন্দ এসে আমাদের সংবাদপত্র-জগতের সাময়িকতা আর সংবাদ-সর্ব্বস্বতার মধ্যে এক নতুন স্থায়ী সুর নিয়ে এলেন।

প্রতিদিনের ঘটনার পেছনে যে চির-দিনের কথা আছে, তাঁর লেখনীতে তাই ফুটে উঠলো, অবিরাম, অজস্রধারায়। তাঁর সমগ্র প্রতিভা আর মনীষা দিয়ে তিনি অপরূপ এক ভারত-সাহিত্য রচনা করলেন, ভারতের অন্তরের ইতিহাস। জাতিয়তার এক নব-দর্শন রচনা করলেন। প্রতিদিনের মানুষকে তার প্রত্যক্ষ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি তার চিরন্তন স্বধর্ম্মের কথা নতুন করে তার সামনে তুলে ধরলেন। বিদেশী শাসকেরা তাদের সমস্ত আইন নিয়ে শত চেষ্টা করেও শ্রীঅরবিন্দের লেখনীকে আইনের শৃঙ্খলে বাঁধতে পারলো না। এই অসাধারণ লেখনী-কৌশল সে-যুগের বৃটীশ প্রহরী ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে এবং তিনি সম্পাদকীয় স্তম্ভে একদা বিস্মিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দের এই প্রতিভাকে স্বীকার করতে বাধ্য হন।

ভারতের স্বধর্ম্মের ইতিহাস ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক কর্ম্মের আদর্শকে প্রথম স্পষ্টভাষায় রূপ দিলেন। করাচী কংগ্রেসের বহু আগে তিনিই প্রথম স্পষ্ট-ভাষায় প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করেন, ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য হলো পূর্ণ স্বাধীনতা এবং দিনের পর দিন "বন্দেমাতরম্" কাগজ এই অদর্শকেই ভারতবাসীর সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এই সম্পর্কে আমাদের ভাষায় একটা নতুন কথার সৃষ্টি হয়, স্বরাজ। এই কথাটীর অর্থ এবং তার অভিব্যক্তির ইতিহাস অনেকের কাছেই হয়ত আজও অস্পস্ট।

সর্ব্ব-প্রথম এই কথাটী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করলেন, একজন মারাঠী, সখারাম গণেশ দেউস্কর, বাংলা ভাষায়, তাঁর নিষিদ্ধ পুস্তক "দেশের কথায়"। তারপর সন্ধ্যা কাগজে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই কথাটীকে জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত করে দিলেন। সেই সময় কলকাতা কংগ্রেসে

দাদাভাই নওরোজী কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসের আদর্শরূপে স্বরাজ ঘোষণা করেন। কিন্তু স্বরাজের মানে তখন অস্পষ্ট ছিল। দাদাভাই নওরোজী স্বরাজ বলতে বোঝালেন, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। তারপর শ্রীঅরবিন্দ এই শব্দটাকে প্রয়োগ করলেন, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশব্দ রূপে এবং ঘোষণা করলেন পূর্ণস্বাধীনতাই হলো ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্য ৮

শ্রীঅরবিন্দের বিপুল সাধনার ইতিহাস এই যুগের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে বিজড়িত। এখানে তার সমগ্র বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে, তাঁর সম্পর্কে আর একটি কথা বলতে চাই। মতবাদের কথা বাদ দিয়ে, দুটী মানুষকে তিনি সে-যুগের তরুণ বাঙালীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। একজন হলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, আর একজন হলেন বিবেকানন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তিনি সাতটী প্রবন্ধ লেখেন, বাংলার আত্মিক ইতিহাসের সাতটী অমর অধ্যায়ন। কিন্তু সে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, বাংলা দেশের কাগজে নয়, মহারাষ্ট্রে, ইন্দুপ্রকাশ কাগজে। সেই সাতটী প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে কেন্দ্র করে শ্রীঅরবিন্দ বাংলার মনের ইতিহাসের যে অভিনব ব্যাখ্যা করেন, তার মধ্যে বাঙালীর ইতিহাসের মর্ম্মকথা নিহিত আছে। নব-জাত বাংলার সেই হলো জন্ম-পত্রিকা। সেই প্রবন্ধ-মালার শেষ লাইনে তিনি বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে মহা আশ্বাসের কথা উচ্চারণ করেছিলেন, আজকের তরুণের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া দরকার, "What Bengal thinks to-morrow, India will be thinking to-morrow week." "বাংলা আগামীকাল যে কথা বলবে, সে কথা ভারতবর্ষ বলবে আগামী সপ্তাহে।"

পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে, এ কথা কি আজ মিথ্যা হয়ে গেল? একথার জবাব দিতে হবে আজকের বাঙালী তরুণ-তরুণীকে!

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া আজকের যুগের তরুণদের একান্ত আবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে। কারণ, আমাদের দেশের আবহাওয়ার গুণে, এক সম্প্রদায়ের ভক্তদের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের ভক্তদের গুরু নিয়ে যে দরকষাকষির ঝগড়া হয়, তার মধ্যে অনেক সময় ভক্ত শিষ্যরা অজ্ঞাতে গুরুদের দেহই মসীলিপ্ত করে ফেলেন। এই জাতীয় একটা বিরূপ মনোভাব মাঝে মাঝে জনসাধারণের ভেতর থেকে ফুটে উঠতে দেখেছি বলেই, আজকের তরুণদের সতর্ক করে দিতে চাই। নীচের উক্তি থেকে বোঝা যাবে, অতি স্বল্পকথার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ কিভাবে বিবেকানন্দকে গ্রহণ করেছিলেন,—

"Vivekananda was a soul of puissance if ever there was one, a very lion among men. We perceive his influence still working gigantically. We know not well how, we know not where, in something not yet formed, something leonine, grand, intuitive upheaving that has entered the soul of India and we say—Behold! Vivekananda still lives, in the soul of the Mother and in the souls of her children!"....

—ভারত-আত্মার মধ্যে বিবেকানন্দের আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে এবং সেখান থেকেই একান্ত জীবন্তভাবে তিনি আজও আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন—স্বল্পকথায় এর চেয়ে নিখুঁত শ্রদ্ধা নিবেদন পরিমাপ আর কিছুই হতে পারে না।

উনিশ শ' পাঁচে যে সব তরুণ বিপ্লবী বাঙালী নিজেদের স্বল্প আয়োজন বা অসহায়তায় ভ্রূক্ষেপ না করে, শস্ত্র হাতে মৃত্যুর বুকে

ক্ষত্রিয়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে, শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন, সেই নতুন ক্ষত্রিয়দের রণগুরু।

সেদিন বিদেশী বিচারকের সামনে আদালতে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষের উকীলেরা শাস্তি থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য যাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করে থাকুন না কেন, আজ ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সে-যুগের সেই প্রাণধর্ম্মী সশস্ত্র-বিপ্লবের প্রধান মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

গীতাকে তিনি এই নব-ক্ষত্রিয়দের হাতে তুলে দিলেন এবং প্রকাশ্য-ভাবে গীতার ক্ষাত্রধর্ম্মকে যে ভাবে ও যে ভাষায় ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, তাতে তরুণ ভারত ভয় মুক্ত অন্তরে ক্ষত্রিয়ের কাম্য রণে মৃত্যু বরণ করতে ছুটলো।

সেই শস্ত্রহীন মৃত্যুভয়ভীত জাতিকে তিনি স্পষ্টভাষায় শোনালেন, এই যুদ্ধ, এই মৃত্যু, এই অস্ত্র, এই বর্ম্ম, এই তীর আর এই ধনুক, এ-ও ভগবানের সৃষ্টি।

—We do not want to develop a nation of women who know only how to weep and how not to strike.

—আমরা চাই না যে আমরা শুধু একটা স্ত্রীলোকের জাত হয়ে বেঁচে থাকি....স্ত্রীলোকের মতন শুধু ঘরে বসে কাঁদি আর স্ত্রীলোকের মতন আঘাত করবার সময় হাত গুটিয়ে নিই!

যখন লালা লজপৎ রায়ের নির্ব্বাসন দণ্ডের সংবাদ অরবিন্দের কাছে এসে পৌছয়, তখন গভীর রাত্রিতে তিনি ঘুমুচ্ছিলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়ে সে-সংবাদের টেলিগ্রাম তাঁর হাতে দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থায় কাগজ পেন্সিল নিয়ে তিনি লিখলেন,...

* * * Indignation meetings? The hour for speeches and fine writings is past. The bureaucracy has thrown the gauntlet. We take it up. Men of Punjab! Race of the Lion! Show these men who

want to stamp you into the dust that for one Lajpat they have taken away, a hundred Lajpats will rise in his place! Let them hear a hundred times louder your war cry—Jai Hindustan!"

* * * বিক্ষোভ দেখাবার জন্যে প্রতিবাদ সভা? তার দিন চলে গিয়েছে! চলে গিয়েছে শুধু মুখের কথা আর বক্তৃতার দিন।—বিদেশী শাসকেরা চায় সংগ্রাম···আমরাও প্রস্তুত। পাঞ্জাবের সন্তান, সিংহের সহোদর তোমরা···আজ যারা তোমাদের এমনি-ভাবে ধুলোয় গুঁড়িয়ে ফেলতে চায়, তাদের স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দাও, একজন লজপৎ রায়কে তারা যেখান থেকে সরিয়ে নিয়েছে সেখানে একশোটা লজপৎ রায় মাথা তুলে উঠবে···শত গুণ তীব্র ভাবে জাগিয়ে তোলো তোমাদের রণ-হুংকার, জয় হিন্দুস্থান!

সমগ্র ভারতবর্ষ সেদিন এই অগ্নিবর্ষী লেখনীর বিদ্যুৎস্পর্শে সচকিত হয়ে উঠেছিল। সেদিন সত্যিসত্যি লেখনী হয়ে ওঠে তলোয়ার!

শ্রীঅরবিন্দের কাছে সংবাদ পৌঁছল, পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে, বন্দেমাতরমের সম্পাদকরূপে তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন।

সংবাদ শুনে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই থানায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। পদ্মপুকুর থানায় তাঁকে আটক করে রাখা হলো। বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসু তাঁর জামিন হয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনলেন।

পুলিশ বন্দেমাতরমের সম্পাদকরূপে তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল। কিন্তু তিনিই যে সম্পাদক, তা প্রমাণ করতে পারলো না। তখন সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম প্রকাশিত হতো না। পুলিশ তাঁর সহকর্মী বিপিনচন্দ্রকে সাক্ষী মানলো।

বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে এসে প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করলেন, এই বিদেশীর আদালতে সাক্ষ্য দিতে আমার অন্তর বারণ করে অতএব আমি এই আদালতের আদেশকে স্বীকার করি না!

শ্রীঅরবিন্দ মুক্ত হলেন কিন্তু আদালতকে অপমান করার অভিযোগে বিপিনচন্দ্র দণ্ডিত ও কারারুদ্ধ হলেন।

দেবী তখন ত্রি-বদনা হয়ে জাতির সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁর এক মুখ হলো, বন্দেমাতরম্, আর দুটী মুখ হলো, সন্ধ্যা আর যুগান্তর।

বন্দেমাতরম্ সারা ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকের কাছে পৌঁছয়—সন্ধ্যা আর যুগান্তর, বাংলার নিজস্ব।

সন্ধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সংবাদপত্রের এক নতুন ঢঙ্ প্রবর্ত্তন করলেন। সাধারণের কথায়, প্রতিদিনের ভাষায়, প্রতিদিনের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা কওয়া।

যুগান্তর প্রস্তুত করে, সাধারণ লোকের মনে আসন্ন বিপ্লবের আটচালা। বিশেষ করে, তরুণ মহলে, ছাত্র মহলে তার বেশী প্রতিপত্তি।

দেখি, একদল তরুণ ছাত্র একমনে যুগান্তর পড়ছে—

—দেখছিস্ না স্পষ্ট লিখে দিয়েছে—

—দেখি দেখি…

টেনে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে, যুগান্তরে লিখছে,…

—"এতদিন আমরা কাগজে যে কথা বলেছি, এখন কাজে তাই করবার জন্যে নতুন লোকদের ওপর যুগান্তর চালাবার ভার দিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি—"

—তার মানে?

—মানে আর বুঝতে পারছিস্ না? এইবার ওরা প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করবে?

—আরে, ইংরেজের বন্দুকের সঙ্গে লাঠী নিয়ে যুদ্ধ করবে নাকি ?

—তাই কি কখনো হয় ? তুই শুনিস্‌নি ?

—কি

—এখানে কেউ তো টিকটিকি নেই ?

—না রে···

চাপা গলায় তারা বলাবলি করে,—সুন্দরবনে গোপনে জাহাজ আসছে য়ুরোপ থেকে···সেখানে গোপনে একদল সন্ন্যাসী গেরুয়া পরে অস্ত্র শিক্ষা করছে···ইত্যাদি···

কিন্তু সুন্দরবন নয়,···

কলকাতা শহরেই, ৩২নং মুরারীপুকুর বাগান রোডে···

পাঁচিল-দেওয়া এক বাগানের ভিতর, একটা বাড়ী···

সামনেই একটা খোলা বারান্দায় মাদুর পেতে জনকয়েক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বসে।

তার মধ্যে একজন কালো, বেঁটে, মোটাসোটা সন্ন্যাসী, বয়স ২৫।২৬ একটা কাঠের চৌকির ওপর "গীতা" পড়ছে···

কয়েকজন ছেলে ছোকরা শুনছে। সন্ন্যাসী গীতার ব্যাখ্যা করছেন.···

—তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বল্লেন, ততো যুধ্যস্ব···শত্রুকে নিধন করে বীরের যা প্রাপ্য গৌরব—সেই বিজিত বসুন্ধরা ভোগ করো!

খোলা দরজা দিয়ে রাস্তা থেকে পাঠরত সন্ন্যাসীদের দেখা যায়।

গঙ্গাস্নান কোরে ফেরবার মুখে এক বৃদ্ধা বাগানে ঢুকে সাধু বাবাদের প্রণাম করে যায়। সঙ্গের নাতীটিকে দেখিয়ে বলে, সাধুবাবা, এই ছেলেটার মাথায় এক পরশো করে দাও বাবা!

পাঠরত সন্ন্যাসী উঠে, ছেলেটীর মাথায় হাত দিয়ে বিড় বিড় করে কি মন্তর পড়ে!

বৃদ্ধা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়।

সমবেত শ্রোতাদের সন্ন্যাসী বিদায় দেয়—এখন আমরা পূজা-অর্চ্চনায় বসবো—আবার কাল পাঠ হবে—

শ্রোতারা চলে যায়।

সন্ন্যাসী পূজা-অর্চ্চনা করতে ভেতরে ঢোকে।

একটী সুন্দর চেহারা তরুণ, বড় বড় চোখ, কাঁধ পর্য্যন্ত বাবরী চুল—সন্ন্যাসীকে দেখে হেসে ওঠে,...

—তা, তুই যে রকম পাকা সাধুবাবা হয়ে উঠেছিস্—শেষকালে এদিকে কিছু না হলে তোকে গুরু করে চেলাগিরি সুরু করে দেবো—

—দেখি, হেম পূজোর যোগাড় কতখানি করলো—

দেখা গেলো, ভেতরে ছোটখাটো একটা কারখানার মতন, সেখানে হেমদা বোমা তৈরী করছে, টেবিলের ওপরে Sulphuric Acid, Puric Acid-এর লেবেল দেওয়া বোতল।

ক্ষুদিরাম এক মনে হেমদাকে সাহায্য করছে।

বাঁবরি চুল-ওয়ালা বারীন্ বলে—আর দুটী রিভলভারের সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু যা টাকা চাইছে—তা তো হাতে নেই...

—তোমার টাকা তোলা Campaign-এর কি হলো

—দেখি, আজও তো বেরুচ্ছি—এক জায়গায় কথা দিয়েছে। লোকে বিশ্বাস করতে চায় না—হেসে উড়িয়ে দেয়—বোঝাতে বোঝাতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়।

বিরাট ড্রয়িংরুম। ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন চারিদিকে। বিপুলদেহ এক ব্যক্তি, দেখলেই বোঝা যায় রীতিমত শাঁসালো লোক।

তার সামনে বারীন।

বারীন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিপ্লব-উত্থানের কথা বলে…মা কালীর নাম করে আমরা জীবন উৎসর্গ করেছি…

বিপুলদেহ হেসে ওঠে, হা…হা…ওসব জানি না…ইংরেজ তাড়াতে পারবে?

—তা না পারি, ঘুমন্ত দেশকে তো জাগাতে পারবো!

—ছেলেমানুষী হে…ছেলেমানুষী…ও সব পাগলামী ছেড়ে দাও…

—বাংলা দেশে এত বেশী সুস্থ লোক আছে যে তার মধ্যে দু'এক জন পাগলের আজ বিশেষ দরকার হয়েছে…

আবার সেই অট্টহাসি…

—ও সব ভেতো বাঙালীর কাজ নয় হে…

বারীন বিরক্ত হয়ে ওঠে।

—কিন্তু আপনি আমাদের সমিতিতে কিছু অর্থ সাহায্য করবেন বলেছিলেন…

—আর বাপু, ভিক্ষে দিতে দিতে গেলাম…এসেছ যখন তোমাকে আর শুধু হাতে ফিরিয়ে দিতে চাই না….এই নাও পাঁচটা টাকা…

—পাঁচ টাকায়…ইংরেজ তাড়াতে হবে! এবার ব্যঙ্গের হাসি হেসে ওঠে বারীন…টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে,—

—ও আপনি রাস্তার ভিখারীদের দিয়ে দেবেন…

রাগে বারীন ঘর ছেড়ে চলে আসে…

থানার পুলিশের কর্তার ঘর।

একজন খবরের কাগজ পড়ছে।

খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে হেড লাইন দেখা যাচ্ছে,—

ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এ্যালেন সাহেবের ওপর গুলি…

আর একখানা খবরের কাগজ, তাতে বড় বড় হেড লাইনে লেখা,—

বাংলাদেশে স্বদেশী ডাকাতের উৎপাত—

আর একখানা খবরের কাগজ…

ছোটলাট সাহেবের ট্রেণে বোমা—

খবরের কাগজের আড়ালে পুলিশের কর্তা রামসদয় বাবুর মুখ দেখা গেল,…

সামনের চেয়ারে আর একজন ইন্‌স্‌পেক্‌টর বসে!

একজন আধাবয়সী বাঙালী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

—অবস্থা যে সঙ্গীণ হয়ে উঠছে গুপ্ত!

—তাই তো দেখছি স্যার!

—ওপরওয়ালাদের কড়া হুকুম, ট্রেণে যারা বোমা মেরেছে তাদের ধরতেই হবে—নইলে চাকরী থাকবে না—

—কিন্তু কোন পাত্তাই তো করতে পারলুম না…

—পারলুম না বল্লে তো হবে না—পারতেই হবে…আমাদের সমস্ত department-এর prestige তা না হলে যায়…

—কি করতে চান?

—সেই বারো জন রেলের কুলীকে arrest করছিলে, তারা হাজতে আছে তো?

—হাঁ…

—তাদেরই আসামী বলে চালাতে হবে…তারপর দেখছি… পাড়ায় পাড়ায় watcher-এর সংখ্যা বাড়িয়ে দাও…

—তাতো দিয়েছি স্যার!

রামসদয় বাবু দণ্ডায়মান লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে,…

—কি হে রজনী…তোমার খবর কি?

—আমি তো আপনার কথা মতন, যুগান্তরের দলের পেছনে লেগে আছি স্যার!

—যেমন করে হোক্, ওদের দলে ঢুকে পড়—

—বড় ভয় করে স্যার···একেবারে গোলাগুলির কাণ্ড!

—আরে ছোঃ—আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি এ সব ঐ যুগান্তরের দলের কাণ্ড—এক ডজন মাথা গরম বাঙালী চ্যাংড়া ছোঁড়া গোটাকতক পটকাবাজী করে ইংরেজ তাড়াবে···ছোঃ—আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি গুপ্ত—ওদের মতন foolish লোক দিয়ে কখনো revolutionary party গড়ে উঠতে পারে না···

—foolish বলছেন কেন স্যার?

—Foolish শুধু নয়···sentimental fool! যে কাজ করতে যাচ্ছে, তার সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই···নইলে যুগান্তর কাগজে ঐ রকম স্পষ্ট করে লেখে, আমরা এবার বোমা তৈরী করতে যাচ্ছি··· theatricallity—স্রেফ্ sentimental theatircallity···রজনী তুমি লেগে থাকো···যাও···

রজনী চলে যায়।

রামসদয়বাবু গুপ্তকে বলে,—তুমি ৩২ নং মুরারীপুকুর বাগানের পাশের বাড়ীতে···

—সে সব বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে স্যার!

—all right···এক হপ্তার মধ্যে দেখবে জাল গুটিয়ে তুলছি···

বাগানের পাশে ভাঙ্গা একতলা একটা বাড়ী।

বাড়ীর ভেতরে সামনে একটা ঘরের মেঝেতে একদল মাতাল হল্লা করছে···

ভাঁড়, খুরি, বোতল ছড়ানো।

একজন শালপাতার ঠোঙ্গায় পেয়াজী বিতরণ করছে···

মধ্যিখানে মাদুরের ওপর একদল তাসের জুয়ো খেলছে···

জোর দান পড়ছে···আর হল্লা উঠছে···তার মধ্যে ক্ষুদিরামকেও দেখা গেল···জুয়োয় দান ফেলছে···

পাশে বিপ্লবীদের আড্ডায় সেই হল্লা শোনা যাচ্ছে—

বারীন অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করে, বাড়ীটা তো খালি ছিল, আজ ক'দিনই শুনছি জোর হল্লা—

—একদল মাতাল এসে জুটেছে দেখছি···ক্ষুদিকে পাঠিয়েছি জানতে···

ক্ষুদিরাম ফিরে আসে,···

—জুয়োড়ীর আড্ডা···জোর জুয়ো চলছে···

বারীন বলে, মন্দ নয়—আমরাও তো জুয়োড়ী···

এমন সময় বোমা ফাটার মতন একটা আওয়াজ ভেতর থেকে আসে।

তারা সবাই ছুটে ভেতরে যায়।

দেখে, হেমদা একটী কিশোর ছেলেকে ধরে মাটীতে শুইয়ে দিচ্ছে।

ছেলেটী যন্ত্রণায় অব্যক্ত চীৎকার করে উঠলো একবার

তার সমস্ত মুখ ঝলসে পুড়ে গিয়েছে···

ডান হাতের দুটো আঙুল উড়ে গিয়েছে···রক্ত ঝরে পড়ছে···

বোমা তৈরী শিখতে গিয়ে তার হাতেই বোমা ফেটে গিয়েছে—

—উঃ···

অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে।

হেমদা তাড়াতাড়ি একটা মলম তৈরী করে।

সেই যন্ত্রণার মধ্যে ছেলেটী বলে ওঠে, শব্দ বাইরে কেউ শুনতে পায় নি তো ?

—না !

একজন দলের লোক ছুটতে ছুটতে এসে জানায়,

—সন্ধ্যা অফিসে পুলিশ হানা দিয়েছে…

বারীন তাকে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে আসে।

—উপাধ্যায় মশাই ?

—শুনলুম, তাঁর নামেও search warrant আছে…

সন্ধ্যা অফিস। কথাবার্ত্তা থেকে জানা যায় পুলিশ এই মাত্র খাতাপত্র তছনচ করে গিয়েছে…চিঠির বাণ্ডিলটা তারা সরিয়ে ফেলেছিল—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মশাই উপস্থিত ছিলেন না বলে, তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে পারেনি, তবে সন্ধ্যার মুদ্রাকরকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে…

বাইরে পায়ের শব্দে তারা সচকিত হয়ে ওঠে, দেখে, স্বয়ং উপাধ্যায় মশাই আসছেন, গৈরিক আলখাল্লা পরা, গলায় ক্রসের চিহ্ন ঝুলছে।

ঘরে ঢুকে ঘরের অবস্থা দেখে বুঝতে পারেন, বলেন—

—হুঁ—তাহলে, বাছাধনেরা এসেছিলেন !

—প্রিন্টারকে ধরে নিয়ে গিয়েছে…

—যাও, এখুনি ভবদেববাবুর বাড়ী গিয়ে জামীনের ব্যবস্থা করে এসো…

—আপনার নামেও warrant আছে !

—থাকা তো উচিত…

—হয়ত এক্ষুনি ঘুরে আসবে…

—আহা, বাছাধনেরা কষ্ট করে আবার ঘুরে আসবে কেন? আমি নিজেই গিয়ে হুজুরে হাজির দিচ্ছি…

—ধরা দেবেন?

—আলবৎ…আমি যোগী…সন্ন্যাসী—আমাকে ধরে রাখতে পারে কে?

পুলিশ থানা।

ইনস্‌পেকটর তল্লাসী—করা search list দেখছেন।

—কোন চিঠি পেলে না?

—ঐ যা খানকতক পেয়েছি…

—হুঁ…(চিঠিগুলো দেখতে দেখতে)—তোমার কি বিশ্বাস, ব্রহ্মবান্ধব গা-ঢাকা দেবে?

এমন সময় দরজায় সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধবের মূর্ত্তি দেখা গেল। সন্ন্যাসী বলে ওঠেন,…

—সে ছেলে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নয় হুজুর। আসামী স্বয়ং হাজির!

সেই রুদ্রমূর্ত্তি সন্ন্যাসীকে দেখে ইনস্‌পেক্টর ভয়ে উঠে দাঁড়ায়, সচকিত হয়ে বলে, hands up!

ব্রহ্মবান্ধব হেসে ওঠেন, বলেন, আরে ছোঃ—মা [illegible]ষী! নিরস্ত্র সন্ন্যাসী!

একজন পাহারাওয়ালাকে ইঙ্গিত করাতে ব্রহ্মবান্ধবকে ভেতরে হাজতে নিয়ে যায়।

উকীল ভবদেববাবু এসে ব্রহ্মবান্ধব এবং মুদ্রাকর দুজনেরই জামীন হন। জামীনে তাঁরা দুজন ছাড়া পান।

রাস্তায় হকার হাঁকছে,…

—সন্ধ্যা গেরেফ্‌তার হলো বাবু!

—ভারি খবর বাবু!

সন্ধ্যার মামলা পুলিশকোর্টে মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের এজলাসে নির্দ্দিষ্ট হলো। আদালতে একটা তুমুল হৈ-চৈ পড়ে গেল।

সন্ধ্যা অফিসে, ব্রহ্মবান্ধব, বারীন প্রভৃতি···তাদের কথাবার্ত্তা থেকে জানা যায়, কিংস্‌ফোর্ড সম্বন্ধে তাদের রাগ, এর আগে যত Sedition মামলা হয়েছে, সবই এই Kingsford-এর এজলাসে, স্বদেশী আসামীদের ওপর কিংস্‌ফোর্ড খড়্গহস্ত,···এবং ব্রহ্মবান্ধবকেও রীতিমত কড়া সাজা দেবে, তাতে তাদের কোন সন্দেহই নেই।

বারীন বলে, তা তার হাতে যতটুকু ক্ষমতা আছে, সে যত পারে তার ব্যবহার করুক, আমরাও এবার দেখবো, বাঙালী ছেলের কল্‌জেতে জোর আছে কি না! জয় মা কালী!

মামলার আগের দিন।

সন্ধ্যা অফিসে ব্রহ্মবান্ধব, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্কতীর্থ মশাইকে ডেকে আনিয়েছেন।

ঘরের বাইরে ইতস্তত তাঁর শিষ্যের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘরের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব, পণ্ডিত পঞ্চানন ও সন্ধ্যার মুদ্রাকর।

ব্রহ্মবান্ধব বলেন, আপনাকে কষ্ট দিয়ে ভাটপাড়া থেকে আনিয়েছি, অপরাধ নেবেন না—

পণ্ডিত উত্তর দেন,—কষ্ট কি! খুশী হয়েই এসেছি। তোমার মত কর্ম্মী সন্ন্যাসীর স্থান দেশের লোকের অন্তরে। গম্ভীর কণ্ঠে ব্রহ্মবান্ধব বলেন—পণ্ডিত মশাই, ভেবেছিলাম ফিরিঙ্গীর আদালতে যাবো না কিন্তু যেতেই যখন হবে, তখন ঠিক করেছি, এমনভাবে যাবো, যাতে বাংলা দেশ এ ঘটনা না ভোলে!

—মানে?

—আমার এই পুণ্য গৈরিকবাসের ওপর ফিরিঙ্গীর কারাগারের পাপ-ছায়া যাতে না পড়ে তার জন্যে এই গৈরিকবাস আমি ত্যাগ করেই আদালতে যাবো। আদালতে যাবো, সাধারণ বাঙালীর মতন বাঙালী হয়ে।

—উত্তম প্রস্তাব!

—তাই ঠিক করেছি, আজ আবার সন্ন্যাস পরিত্যাগ করে, বাঙালী ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ধারণ করবো। আদর্শ হিন্দু ব্রাহ্মণের রুদ্রমূর্ত্তিতে আমি ফিরিঙ্গীর সামনে উপস্থিত হবো···আপনি জানেন, আমি অন্তরের তাগিদে খৃষ্টান হয়েছিলাম, তাই আজ আবার যদি হিন্দু হই, তা'হলে কি আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? এই জন্যেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

—আপনার মতন প্রকৃত সাধুর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের কোন প্রয়োজন নেই তবে লৌকিক বিধানঅনুযায়ী আপনি গঙ্গাস্নান করে যজ্ঞোপবীত ধারণ করবেন, তা'হলেই হবে!

—বাঁচালেন আমাকে···আমি তাই-ই করবো···গঙ্গাস্নান করে আবার বাঙালী ব্রাহ্মণ হবো—এবার ব্রহ্মবান্ধব নয়—আবার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হবো—

•

মামলার দিন।

ব্রহ্মবান্ধব আজ বাঙালী ব্রাহ্মণের মতন রেশমের ধুতি পরেছেন, গায়ে চাদর, গলায় মোটা করে ধবধবে পৈতে···

সামনে মুদ্রাকরকে একদল ছেলে বরের মতন করে সাজিয়ে গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দন লেপে দিলো—

ব্রহ্মবান্ধব হেসে বলেন,

—আজ আমরা বরযাত্রায় যাবো…ভাল করে বরকে সাজা… ওরে…শাঁখ বাজা…শাঁখ বাজা

একদল ছেলে শাঁখ বাজায়…

ব্রহ্মবান্ধব জিজ্ঞাসা করেন—ব্যাণ্ডপার্টি এসেছে তো ?

—হাঁ…

—তাহলে, বরও প্রস্তুত ?

—বরযাত্রীরাও প্রস্তুত…

বরযাত্রীদের গলায় একটা করে ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়—অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয় না।

ব্রহ্মবান্ধব হাসতে হাসতে বলেন, বাঙালী আজ দেখুক, কি করে কারাগারে যেতে হয়…চল্…শুভলগ্নের আর দেরী নেই…বাজা… বাজা রে, বাজনা বাজা…

রাস্তায় একদল ছেলে ব্যাণ্ড বাজিয়ে চলে। ব্যাণ্ডে বাজে—বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ…

সামনে বর বেশী মুদ্রাকর…

আর পুরোহিত বেশে ব্রহ্মবান্ধব রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেন।

শোভাযাত্রা আদালতের দিকে চলতে আরম্ভ করে।

আদালতের সামনে আজ লোকে লোকারণ্য।

এত ভিড় যে সার্জেন্ট আর তাদের আটকে রাখতে পারছে না।

সার্জেন্ট মাঝে মাঝে তাড়া করে যায়, আর তারা বন্দেমাতরম্ বলে চেঁচিয়ে ওঠে,…

এমন সময় ব্যাণ্ডের আওয়াজ কানে আসে…

জনতা উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

ব্যাণ্ড বাজিয়ে বরযাত্রীর দল আদালতের সামনে এসে উপস্থিত।

সমবেত জনতা চীৎকার করে ওঠে, মেঘমন্দ্রে, বন্দেমাতরম্ !

আদালতের ভেতর এজলাসে, কিংসফোর্ডের কানে সেই গর্জ্জন গিয়ে পৌঁছতে, হাতের দণ্ড টেবিলের ওপর জোরে জোরে ঠুকে দাঁতে দাঁত দিয়ে বলে ওঠে,—

—Bande-Mataram—Stop ! Stop ! that nuisance…

সার্জ্জেণ্ট আদেশ পালন করতে বেরিয়ে যায়।

ব্যাণ্ডের আওয়াজ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিংসফোর্ড মুহুরীকে জিজ্ঞাসা করে, What's that noise ?

একজন উকীল জানালা দিয়েদেখে জবাব দেয়, Band party my lord !

Kingsford—Band party …in police court ?

এমন সময় বরবেশী মুদ্রাকরকে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব প্রবেশ করেন—

—আজ্ঞে, হুজুর ! বরযাত্রী এসেছি…এস হে বর !

সমস্ত আদলত স্তম্ভিত, নীরব…

কিংসফোর্ড বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে—What's this nuisance !

মুহুরী উঠে দাঁড়িয়ে জানায়, আজ সন্ধ্যার সিডিশন মামলা—ঐ লোকটাই প্রধান আসামী। রাগে কিংসফোর্ড বলে,—I will teach the man a lesson…

বাইরে জনতা ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠতে থাকে।

একজন ফিরিঙ্গী সার্জ্জেণ্টকে তারা ক্ষেপাতে সুরু করে দেয়।

তাকে দেখে, আর বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে ওঠে।

সে-ও রাগে ফুলতে থাকে।

জনতা ভ্রূক্ষেপ না করে ঘন ঘন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে থাকে।

সার্জ্জেণ্ট তেড়ে যেতে, একদল লোক পালিয়ে যায়, কিন্তু পনেরো বছরের একটী ছেলে সোজা রুখে দাঁড়ায়।

সার্জ্জেন্টের সমস্ত রাগ তার ওপর গিয়ে পড়ে। হাত ধরে টেনে তর্জ্জন করে, ওঠে What's you are howling for!

সুশীল সেন, ছেলেটির নাম, সার্জ্জেন্টের কবল থেকে জোর করে হাত ছাড়িয়ে নেয় এবং সোজা দাঁড়িয়ে বলে, বন্দেমাতরম্?

সার্জ্জেন্ট রাগে তাকে ঘুষি মারবার জন্যে হাত তুলতেই ছেলেটী সজোরে তার মুখে এক ঘুষি বসিয়ে দেয়। সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে সার্জ্জেন্ট টাল খেয়ে পড়ে যায়।

জনতা দূরে সরে গিয়ে চীৎকার করে ওঠে, সাবাস!

সঙ্গে সঙ্গে আদালতের ভেতর থেকে একদল পাহারাওয়ালা এসে সুশীলকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে।

আদালতের ভেতরে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ব্রহ্মবান্ধব!

—যা করেছি, যা লিখেছি, জন্ম-জন্মান্তর তাই করবো, তাই লিখবো…কোন ফিরিঙ্গীর সাধ্য নেই এই হিন্দু ব্রাহ্মণকে শাস্তি দেয়!

সমস্ত আদালত নিথর নীরব।

কিংসফোর্ড মামলার দিন ফেলে—All right…next day…

ব্রহ্মবান্ধব কাঠগড়া থেকে নেমে দাঁড়ান, এবং আদালত ছেড়ে বাইরে আসেন।

তখন সুশীলকে বদ্ধ অবস্থায় কাঠগড়ায় নিয়ে হাজির করা হয়। এবং সার্জ্জেন্ট তার বিরুদ্ধে দাঙ্গা করার অভিযোগ আনে। কিংসফোর্ড তৎক্ষণাৎ হুকুম দেয়—15 lashes before the court…

প্রকাশ্য আদালতের সামনে ১৫ ঘা বেত…

আদালতের প্রাঙ্গণে থামে সুশীলকে বাঁধা হয়।

একজন পাহারাওয়ালা লম্বা বেত নিয়ে তাকে প্রহার করতে সুরু

করে। এক একবার বেত পড়ে, আর সুশীল চীৎকার করে ওঠে, বন্দেমাতরম্।

চোদ্দবারের পর পুলিশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে সুশীল বলে, আর এক ঘা বাকি আছে!

এই সংবাদ বিপ্লবীদের কাছে পৌছতে, তারা কিংস্‌ফোর্ড-নিধনের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এক নতুন ব্যবস্থা।

দেখা গেল ক্ষুদিরাম একটা মোটা বইএর ভেতর থেকে পাতা কেটে একটা গোল গর্ত্ত করছে…

হেমদা আর উল্লাসকর দাঁড়িয়ে।

উল্লাসকরের হাতে একটা গোল ছোট বোমা…

বলে, কিংসফোর্ডের জন্যে আলাদা করে তৈরী করেছি…

ক্ষুদিরাম সেটী নিয়ে মেপে দেখে বই-এর গর্ত্তের ভেতর ঠিক বসে কি না....

হাসপাতালের বেড্

শয্যায় ব্রহ্মবান্ধব শায়িত।

আসে-পাশে লোকজন স্থির, নীরব। অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় উপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করেন,…

—মামলার দিন কবে?

—কাল!

ডাক্তার ওষুধ ঢেলে উপাধ্যায়ের সামনে ধরেন,

—এটা খেয়ে নিন্, পেটের যন্ত্রণাটা আশা করছি এতেই কমে যাবে…

ব্রহ্মবান্ধব গেলাসটী নিয়ে পাশে রেখে দেন। হেসে বলেন,

—ওষুধের আর দরকার নেই ডাক্তার! ফিরিঙ্গী আমাকে

শাসিয়েছে শাস্তি দেবে···দেখি, কি করে সে ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করে···কই···কোথায় গেল ?

কি যেন খুঁজতে থাকেন চোখ দিয়ে···

—কি খুঁজছেন ?

ব্রহ্মবান্ধব বলে ওঠেন···

—কালী কাল-ভৈরবী ছিন্নমস্তা জননী আমার···

একজন বালিশের তলা থেকে কালী-মূর্ত্তির একখানি পট তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরে···

—এই তো···এই তো···মা আমার···মা কালীর সন্তান আমরা··· মৃত্যুকে আমাদের ভয় ?

এমন সময় একটা জোরে হেঁচকি ওঠে···

ডাক্তার ওষুধের গ্লাসটা মুখের কাছে নিয়ে বলে,—এটা খেয়ে ফেলুন।

হাত নেড়ে ব্রহ্মবান্ধব বারণ করেন।

—আমি···ফিরিঙ্গীকে দেখিয়ে গেলাম···এই···(নিজের বুড়ো আঙ্গুল তুলে দেখান) আর আমার দেশের ছেলেদের জন্যে দিয়ে গেলাম···মরবার আশীর্ব্বাদ···বন্দে···মাতরম্···

সমবেত সকলে শান্তকণ্ঠে বলে ওঠে, বন্দেমাতরম্···

ডাক্তার শাদা চাদরটা মুখের ওপর দিয়ে টেনে দেয়!

কিংসফোর্ড রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে···

সাদা পোষাকে দুজন বডিগার্ড সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে···

হঠাৎ একদল ছেলে তাকে দেখে বলে ওঠে, ঐরে কিংসফোর্ড সাহেব!

সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষেপাবার জন্যে একটী ছেলে থামের আড়াল থেকে চীৎকার করে ওঠে, বন্দেমাতরম্!

কিংসফোর্ড থেমে দাঁড়ায়···রাগে হাতের ছড়িটা তুলে, কোন্ দিক থেকে শব্দটা আসছে অনুমান করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কাউকেই দেখতে পায় না। রাগে বিড়্বিড় করে গালাগাল দেয়।

কয়েক পা এগিয়ে যেতে সামনে থেকে আর দুটো ছেলে কিংসফোর্ডকে পেরিয়ে যায়···সাবধান হয়ে সাহেব সরে দাঁড়ায়।

ছেলে দুটো পেছনে গিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে, বন্দেমাতরম্···

সাহেব চীৎকার করে ওঠে,—পাকড়ো···পাকড়ো···রাসকেল 'লোগ'···

ছেলে দুটি দৌড়ে পালায়···

কিংসফোর্ড রাগে কাঁপতে থাকে। আর এগুবে কি ফিরে যাবে ঠিক করতে পারে না। সঙ্গের বডিগার্ড সভয়ে বলে,—

—হুজুর, ঘর লৌট চলিয়ে....

কিংসফোর্ড গর্জ্জে ওঠে, চোপ্রও!

এমন সময় ৮।৯ বছরের একটা ছেলে সাহেবের সামনে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়।

—সাহেব, সেলাম!

সাহেব খুশী হয়ে পকেট থেকে চকোলেট বার করে খুশী হয়ে বলে,—Good boy!

চকোলেটটা হস্তগত করে ছেলেটা মুখ ভেংচে বলে ওঠে, সাহেব, বন্—ডে মা—টারম্···

সাহেব ছড়ি তুলে তেড়ে যায়···Rascal imp···

ছেলেটা দৌড়ে পালায়....

কিংসফোর্ড আকাশে ছড়ি আস্ফালন করতে করতে বলে—This horrible Bande-mataram will make me mad.

পুলিশের স্পাই রজনী রাস্তায় অবিনাশ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করে।

রজনী বলে—এই যে দাদা, সেদিন থেকে দেখা করবার জন্যে হন্যে হয়ে আছি—অবিনাশ সংক্ষেপে উত্তর দেন, হাঁ…

—আপনারাই ধন্য…সার্থক আপনাদের জীবন—

—কেন ?

—রাতদিন মহাপুরুষের সঙ্গে আছের, সেটা কি কম সৌভাগ্যের কথা ?

রজনী চেষ্টা করে জানতে, অরবিন্দ তাদের বাগানে কি ভাবে আসা-যাওয়া করেন। অবিনাশ বিস্মিত হয়ে জবাব দেন—মহাপুরুষ আবার কাকে দেখলেন আপনি ?

—মানে ? আপনি কি অরবিন্দকে যে-সে লোক ভাবেন ?

—আরে মশাই, কোথায় অরবিন্দ, আর কোথায় আমরা ! মাঝে মধ্যে অবিশ্যি দেখাশোনা হয়েছে…কিন্তু যে রাশভারী লোক…কারুর সঙ্গেই কথা বলেন না !

—কতদিন স্বপ্নে তাঁকে দেখেছি…তাঁর ভবানী মন্দির…আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদলে দিয়েছে….(এদিক ওদিক চেয়ে) আপনাকে অবিশ্যি বলতে বাধা নেই…গীতার মতন বইখানা এই দেখুন বুকে করে ঘুরিফিরি… ভয়হয় কোন্ সময় কোন্ শালা ডিটেকটিভ…

অবিনাশ স্বভাবতই একটু সরল হৃদয় লোক। রজনী তাকে দিয়ে পার্কে বসে। নিজের জীবন সম্বন্ধে একটা কাল্পনিক গল্পে দিব্যি গুছিয়ে বলে এবং তার নিঃসঙ্গ জীবন সে স্বদেশ-সেবায় উৎসর্গ করতে রাজী আছে, ঘুরে ফিরে তা জানায়।

নানা ভাবে সে অবিনাশকে আবেদন জানায়, তাদের দলে তাকে ভিড়িয়ে নিতে। অবিনাশ সতর্কভাবে তাকে এড়িয়ে চলে। বলে,

তারা ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ে থাকে···যদি গুরুর কৃপায় একটু ধ্যান-ধারণ হয়।

রজনী রামসদয় বাবুকে যথাযথ সব রিপোর্ট দেয়।

চতুর রামসদয় বলে, ঠিক জায়গায় ধরেছ। ওদের অত সাবধানতা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ভেতরে গোলমাল আছে। লেগে থাকো লোকটার পেছনে।

সুবোধ মল্লিকের বাড়ীর ভেতর।

একটা ঘর। বিপ্লবীদের বিচার সভা।

অন্ধকার···চাঁদের আলোয় যেটুকু আলো দেখা যায়।

সেই আধো আলোয় একটা উঁচু তক্তার ওপর তিনজন লোকের সিলুটী মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে, শ্রীঅরবিন্দ, সুবোধ মল্লিক আর পি, মিত্তির।

তক্তার নীচের দিকে মেঝেতে নীরবে একদল ছেলে বসে, তারা মধ্যে বারীনের চেহারা সুস্পষ্ট।

বারীন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, কিংসফোর্ড যে রকম অত্যাচারী হয়ে উঠেছে, এখনই তাকে সরিয়ে ফেলা একান্ত দরকার। আপনাদের মত চাই!

সব নীরব। তারপর তক্তার ওপরে তিনজানে একে একে প্রত্যেকেই বলেন,···

Yes, Kingsford must die!

I concur.

I concur.

বিপ্লবীদের বিচার অধিবেশন শেষ হয়ে যায়।

মুরারীপুকুর বাগানের ভেতর। উল্লাসকরের বই-বোমা তৈরী হয়ে গিয়েছে।

সেটাকে ভাল করে কাগজে মুড়ে, তার ওপরে ঠিকানা লেখা হচ্ছে···

Mr. Kingsford....

Chief Presideney Magistrate.

বারীন সেটা পোষ্ট করবার জন্যে অবিনাশের হাতে দিয়ে বলে,···

—কিংসফোর্ড নিধনায় গচ্ছ···

গুপ্তচর রজনী অবিনাশকে বহু কষ্টে ভিজিয়ে আজ বাগানে অবিনাশের সঙ্গে এসেছে।

তার সম্বন্ধে সমস্ত কথা বারীনকে অবিনাশ জানায়। তাকে দলে নেবার আগে বারীন তাকে পরীক্ষা করে দেখবে। তাই সে অবিনাশের সঙ্গে বাগানে এসেছে।

বারীনের প্রশ্নে ক্রমশ সে থতমত খেয়ে যেতে থাকে এবং তার উত্তরের ভাবভঙ্গী থেকে বারীন বুঝতে পারে, লোকটা খুব সম্ভব স্পাই।

রজনী বাগানের ভেতরটা দেখবার জন্যে অত্যধিক আকুলতা দেখায়।

বারীন চোখের ইঙ্গিতে দলের লোকদের সতর্ক করে দেয়।

কথাবার্ত্তার শেষে রজনী বলে, আমার মনে হচ্ছে আপনি হয়ত আমাকে সন্দেহ করেছেন কিন্তু আমাকে যে-পরীক্ষা দিতে বলবেন, আমি তা দিতে রাজী আছি।

বারীন বলে—আপনি আসতে চান্, আসতে পারেন, কিন্তু আপনি আমাদের যা মনে করছেন, সত্যি আমরা তা নই···আমরা

বিবেকানন্দের শিষ্য···আমাদের চেষ্টা যদি যোগশক্তি অর্জ্জন করে কিছু করতে পারি···

এমন সময় দীর্ঘ জটাজুট চিমটাধারী বিভূতিমাখা এক সন্ন্যাসী সত্যসত্যই সেখানে আবির্ভূত হন।

সন্ন্যাসীকে দেখে, বারীন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো।

—আইয়ে গুরুজী !

সন্ন্যাসী বলেন—কল্যাণমস্তু !

রজনী ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। একটু হকচকিয়ে যায়।

বারীনের ইঙ্গিতে অবিনাশ তাকে বাইরে নিয়ে যায়।

রজনী কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ইনি কে ?

—মস্ত বড় একজন সাধুপুরুষ···পশ্চিমে থাকেন···নাম শ্রীবিষ্ণুভাস্কর লেলে···

রজনী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার বরাতই মন্দ !

অবিনাশ তাকে সমঝিয়ে দিবার জন্যে বলে, আমরা যদি সত্যিই সেই স্বদেশী দলের লোক হতাম, তাহলে আপনি কি আর এই বাগান থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন !

রজনী থতমত খেয়ে যায়।

—মানে ?

—যারা মরবার জন্যে বেরিয়েছে, তাদের চেহারাই আলাদা !

—হাঁ···হাঁ তা তো বটেই···

বিষ্ণুভাস্কর লেলে বারীনকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, সে যে পথ নিয়েছে, সে পথ ভ্রান্ত।

বলে, বেটা, আমার কথা শোন্···সব গাছের মাটী সমান নয়··· দেশকে মানুষকে মুক্ত করতে হলে, কি তা রক্তারক্তি ছাড়া হয় না ? আমি বলছি, দেখে নিস্, ভারত বিনা রক্তপাতেই স্বাধীন হবে...

—কি করে ?

—সেই কথা জানাবার জন্যেই তো আমি দূর পথ থেকে এসেছি। তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো…সে-পথ আমি তোকে দেখাবো—নির্জ্জন গুহায় সাধনা করে এমন শক্তি পাবি—সেদিন নিজের কাণে শুনতে পাবি ভগবানের আদেশ। ভেতরে সে-দৈবী শক্তি না পেলে, এত বড় দেশে, এত লাখ লাখ লোকের ভাগ্য নিয়ে কেউ খেলতে পারবে না। তোর দাদার মধ্যে সে শক্তি আছে, তোর মধ্যেও দেখেছি, তাই তোদের ডাকতে এসেছি, এসব খেলনা ফেলে দিয়ে আমার সঙ্গে চল্—

—তা হয় না গুরুজী, গীতা আর অসি ছুঁয়ে শপথ করেছি যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন এ ব্রত ছাড়বো না…

—বেশ তো, তোর ব্রত তো ছাড়তে বলছি না, আগে শক্তি যোগাড় করে নে—

—অত ধৈর্য্য আমার নেই…

—তা হলে এত বড় কাজ কি করে করবি ?

—বড় ছোট জানি না…অন্তত দশজন ঘুমন্ত লোককেও তো জাগিয়ে যেতে পারবো…

—তাতে কিছু হবে না…আমি স্পষ্ট দেখছি তোর এ পথ ভুল…সামনেই তোর মহাবিপদ !

—বিপদ ! মৃত্যুর চেয়ে আর কি বিপদ হতে পারে ?

—সে-বিপদ মৃত্যুর চেয়ে বড়..

—তবুও গুরুজী…আমার শপথ আমি ছাড়বো না…

—বেশ, জোর আর করবো না…ফিরেই আমি চল্লাম…কিন্তু তবু মনে রাখিস্, এ পথ ঠিক পথ নয়…

বিষ্ণুভাস্কর লেলে চিমটে বাজাতে বাজাতে চলে যান।

রাত্রির অন্ধকারে বাগানে ভূতের মতন ঘুরে বেড়ায় বারীন্—এ পথ ভুল ? তবে ? কোন্ পথ ?

সকাল হতেই অবিনাশ কাগজ কিনতে ছোটে। এটা তার নিত্যদিনের অভ্যাস। তার ওপর কিংসফোর্ডকে বই-বোমা পাঠানো হয়েছে। তার খবরের জন্যে তারা সবাই উৎসুক হয়ে রয়েছে।

কাগজ নিয়ে আসতেই সবাই তাকে ছেঁকে ধরে।

—ফাটলো ?

অবিনাশ বলে, দেখছি, আমাদের কপালই ফাটলো !

—কেন ?

—খবর দেখছি, কিংসফোর্ড সাহেব বদলী হয়ে যাচ্ছে মজঃফরপুরে…

বারীন গম্ভীর হয়ে বলে, মজঃফরপুর খুব বেশী দূরে নয় !

কিংসফোর্ড সাহেব বদলী হয়ে যাচ্ছে ! গাড়ী তৈরী।

বেয়ারা পোঁটলা, বাক্স, গাড়ীতে তুলছে।

কিংসফোর্ড যাবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে।

এমন সময় দারোয়ান সেই বই-বোমা নিয়ে কিংসফোর্ডের হাতে দেয়।

কিংসফোর্ড নেড়েচেড়ে দেখে।

—এ কেতাব কোন্ ভেজা ?

এমন সময় আর্দ্দালী এসে বলে,—

—গাড়ী তৈয়ার হুজুর…

কিংসফোর্ড ছিঁড়তে গিয়ে আর ছেঁড়ে না, বেয়ারার হাতে দিয়ে দেয়।

—আবি রাখ্ দেও…

কিংসফোর্ড গাড়ীতে গিয়ে ওঠে।

বেয়ারা বইটার কভার ছিঁড়ে বইটা খুলতে যায়…

অমনি তুমুল আওয়াজ করে বোমাটা ফেটে পড়ে।

কিংসফোর্ডের টম্‌টম তখন টগবগ করে এগিয়ে চলেছে।

মৃত্যু কি মানুষ দিতে পারে?

মুরারীপুকুর বাগান।

বিপ্লবীদলের গোপন অধিবেশন বসেছে!

বারীন বলে, Revolutionary High Command বিচার করে কিংসফোর্ডের দণ্ডাদেশ দিয়েছে—কিংসফোর্ড আমাদের এলাকার বাইরে মজঃফরপুরে চলে গিয়েছে—বুঝেছি আমাদের বই-বোমা fail করেছে কিন্তু আমাদের দলপতির আদেশ মজঃফরপুর পর্য্যন্ত যাবে। এ কাজের ভার কে নেবে?

নরেন গোঁসাই উঠে বলে, আমি!

ক্ষুদিরাম বলে ওঠে—গুরুজী!

বারীন বলে, এই কাজের ভার আমি দিলাম ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীর ওপর!

ক্ষুদিরাম বলে—প্রফুল্ল চাকী?

বারীন তার পাশ থেকে প্রফুল্লকে টেনে পাশে নিয়ে বলে,—সবে নতুন আমাদের দলে এসেছে—আমি নিজে এর দীক্ষা দিয়েছি—ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল··· তোমরা রাজী?

—রাজী গুরুজী!

—তাহলে রাত্রিতে তোমরা দুজনে আমার সঙ্গে দেখা করবে···

রাত্রি।

একটা অন্ধকার ঘরে খড়্গধারিণী কালীমুর্ত্তির সামনে প্রদীপ জ্বলছে···

প্রতিমার দুইদিকে দাঁড়িয়ে, ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল।

বারীন—মার চরণ ছুঁয়ে শপথ কর, হয় মৃত্যু নয় কার্য্যসিদ্ধি!

দুজনে নতজানু হয়ে প্রতিমার পাদস্পর্শ করে বলে,—

—হয় মৃত্যু, নয় কার্য্যসিদ্ধি!

বারীন—যতদিন আবার জয়ী হয়ে আড্ডায় ফিরে না আস, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের দুজনকে অন্য নামে আত্মপরিচয় দিতে হবে। ক্ষুদিরাম আজ থেকে তোমার নাম, দুর্গাদাস সেন, আর প্রফুল্ল তোমার নাম—দীনেশ।

তারপর দেবীর চরণ থেকে একখানা ছোরা তুলে নিয়ে বারীন হাতের ওপর বসিয়ে দেয়, রক্ত ঝরে পড়ে।

সেই রক্ত নিয়ে দুজনার কপালে তিলক পরিয়ে দেয়।

—বন্দেমাতরম্!

—বন্দেমাতরম্!

—এতদিন তোমাদের আলাপ হয়নি, আজ মৃত্যুর পথে তোমাদের বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠুক।

তারপর একটা হ্যাণ্ডব্যাগ ক্ষুদিরামের হাতে তুলে দেয়, এতে আছে⋯জয়ী হয়ে ফিরে এসো!

দুজনে নত হয়ে প্রণাম করে।

মজঃফরপুর রেলষ্টেশন।

ব্যাগ হাতে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল প্লাটফর্ম্মে নামে।

ষ্টেশনের বাইরে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করে, ধরমশালা কিধার ভাইয়া?

লোকটা সামনের পথ দেখিয়ে বলে,⋯

—ম্যাজিষ্টর সাহেবকো কুঠী বরাবর⋯

পরস্পর চোখের ইঙ্গিত করে।

ধরমশালার ঘরে।

ঘরের জানালা থেকে দেখা যায় কিংসফোর্ড সাহেবের কুঠী।

ধরমশালার চাকর এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

ক্ষুদিরাম তার সঙ্গে আলাপ জমায়। জিজ্ঞাসা করে, সামনে ঐ কুঠী, কার ?

—ম্যাজিস্টর সাহেবের…

—কে এখন ম্যাজিস্ট্রেট ?

—কলকাত্তাসে নয়া আয়া…কিলন্‌ফোর্ট সাহাব—বড় জবরদস্ত হাকিম…

ক্ষুদিরাম আশ্বস্ত হয়।

জানালা থেকে দুজনে দেখে বিকেলে একটা পুরানো ফীটন গাড়ী করে কিংসফোর্ড সাহেব আদালত থেকে বাংলোতে ফিরে আসে।

কিছুক্ষণ পরে সেই ফীটন গাড়ী করেই আবার ক্লাবে যায়।

ক্লাব থেকে রাত্রিবেলা আবার ফীটনে করে বাংলোয় ফেরে।

কলকাতার মুরারীপুকুর বাগানে রোজ সকাল বেলা বারীন নিজের হাতে datecard ছিঁড়ে নতুন তারিখের cardটা বার করে।

সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ সেদিনকার কাগজটা নিয়ে আসে।

তন্নতন্ন করে হেডলাইন খোঁজে…

২৫-এ এপ্রিল-এর তারিখের কার্ড ছিঁড়ে ২৬-এ করে…

২৬-এর পর ২৭…

২৭-এর পর ২৮…

২৮-এর পর ২৯…

২৯-এর পর ৩০শে এপ্রিল

অবিনাশ ৩০শে এপ্রিলের কাগজখানা বারীনের হাতে তুলে দেয়।

বারীন জিজ্ঞাসা করে, খবর বেরুলো?

—কৈ, না!

—তাই তো! এত দেরী···ভাবালে দেখছি···!

৩০শে এপ্রিল···মজঃফরপুর···

ধরমশালা থেকে কোমরে রিভলভার ঠিক করে নিয়ে, পকেটে হাত-বোমা নিয়ে দুই বন্ধুতে বেরিয়ে পড়ে।

কিংসফোর্ডের বাংলোর সামনে ক্ষুদিরাম একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করে।

প্রফুল্ল বলে, নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।

নদীর ধারে···

একটী চাষী ছেলে বাঁশী বাজাচ্ছে···

প্রফুল্ল একমনে শোনে···

সামনে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে···

মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে, যদি কাল এই সূর্য্যাস্ত আর না দেখতে পাও?

চাষী ছেলেটী ডাকে—বাবুজী!

—ক্যা ভাই!

—আপ্ গাইয়ে—বাংলা গানা বহুত মিঠা···হাম বাঁশুরী বাজায়েঙ্গি।

প্রফুল্ল গান গায়,···

ও আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি···

এমন সময় ক্ষুদিরাম এসে দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে,...

—কিংসফোর্ড ক্লাবে এসেছে...

তারা দুজনে ক্লাবের রাস্তার দুধারে গিয়ে দাঁড়ায়।

ক্লাবের ভেতর।

গ্রামোফন রেকর্ড বাজছে।

মাঝখানে বিলিয়ার্ড টেবিলে দুজন বিলিয়ার্ড খেলছে...

দরজার দুদিক থেকে দুজনে টানা-পাখাওয়ালা ঘুমোতে ঘুমোতে পাখা টানছে।

একটা ছোট টেবিলে মিসেস্ কেনিডি এবং তাঁর মেয়ে মিস্ কেনেডি কিংস্‌ফোর্ডের সঙ্গে গল্প করছে...

বেয়ারা বরফ-দেওয়া সোডা পরিবেশন করে গেল।

মিসেস্ কেনেডীকে কিংসফোর্ড জিজ্ঞাসা করে,

—মিঃ কেনেডী কবে পুরুলিয়া থেকে আসছেন ?

—খুব সম্ভব ২।৩ দিন পরে...

মিস্ কেনেডী উঠে দাঁড়ায়, বলে,...

—মা বাড়ী চল...হয়ত লরা এসে ফিরে যাবে...

—যাবো কি করে ? আমার ফিটন তো এখনো আসে নি ?

মিস্ কেনেডী কিংসফোর্ডকে বলে, আপনার কচ্য়ানকে বলুন না, আমাদের একটু পৌঁছে দিক !

—Most gladly !

কিংসফোর্ড কচোয়ানকে ডেকে আদেশ দেয়—মেমসাহাবকো পৌঁছা দেও...

মিসেস্ কেনেডী মেয়েকে নিয়ে গাড়ীতে ওঠে।

ফিটন ঘন্টি বাজাতে বাজাতে চলতে আরম্ভ করে।

রাস্তার ধারে ক্ষুদিরাম সজাগ হয়ে ওঠে।

প্রফুল্ল বলে, ঐ কিংসফোর্ডের ফীটন আসছে…

তারা পকেট থেকে হাতবোমা বার করে নেয়…

ঘন্টি বাজাতে বাজাতে ফীটন তাদের সামনে এসে পড়ে।

দুদিক থেকে অন্ধকারে তারা বোমা ছোঁড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আওয়াজ হয়…

মিসেস্ কেনেডী চীৎকার করে ওঠে…

কচোয়ান গাড়ী থেকে লাফিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে…

গাড়ীতে আগুন ধরে গিয়েছে…

ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল দুজন দুদিকে ছুটে পালায়…

কিংসফোর্ডের বদলে মরেন মিসেস্ কেনেডী আর তাঁর মেয়ে।

মানুষ সত্যই কি মৃত্যু দিতে পারে?

পুলিশ ষ্টেশন।

ফোনে প্রত্যেক্ ষ্টেশনে খবর চলে গেল…

বাঁকিপুর, পাটনা, মোকামাঘাট, সমস্তিপুর…

মুরারীপুকুর বাগানে।

১লা মের তারিখের কার্ড খুলতে, বারীনের সামনে অবিনাশ ছুটতে ছুটতে সকালের Empire কাগজখানা নিয়ে ধরে!

—সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে!

—কি ব্যাপার? দেখি!

বারীন খবরের কাগজে পড়ে,…

"মজ…ফরপুরে কিংসফোর্ড সাহেবের ফীটনে, কিংসফোর্ড সাহেব মনে করিয়া মিসেস্ কেনেডী ও তাঁহার কন্যার উপর নৃশংসভাবে

বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছে। চারিদিকে জোর খানাতল্লাসী চলিতেছে। পুলিশ জানে, এই হত্যাকাণ্ড কাহাদের কার্য্য। শীঘ্রই এক বিরাট দল ধরা পড়িবে বলিয়া তাহারা আশা করে...”

রাত্রিতে বাগানে দলের অধিবেশন বসে। কি করা যায়?

কানাঘুষায় জানা গিয়েছে, পুলিশ বাগানের সন্ধান পেয়ে গিয়েছে—আজ রাত্রিতেই হয়ত এসে পড়বে।

কেউ পরামর্শ দেয়, পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়তে। বারীন বলে, এত তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র নিয়ে যাই কোথা? তা ছাড়া, এত কষ্টের সব জিনিস, প্রাণ থাকতে নষ্ট করতে পারি না...আপাতত মালগুলো মাটির ভেতর ট্যাঙ্কে সরিয়ে ফেল...

দলপতির আদেশ মত মাটির তলায় এক ট্যাঙ্কে রিভলভার, বোমা, সাজ-সরঞ্জাম সব সরিয়ে ফেলা হলো, ভাল করে তার ওপর মাটি দেওয়া হলো।

এমন সময় বাইরে মস্ মস্ জুতার আওয়াজ।

বারীন বেরিয়ে গিয়ে দেখলো বীটের পুলিশ।

বারীনকে দেখে হঠাৎ আজ পুলিশটা বলে উঠলো আরে তোম্ লোক বাগিচামে কিস্ ফিকিরসে হ্যায়?

বারীন উত্তর দেয়, ফিকির কি বাবা। সাধু সন্ন্যাসী মানুষ... ভজন পূজন করি...

—ভজন পূজন...হাঁ...হাঁ...দেখা যায় গা...

পাহারাওয়ালা অর্থপূর্ণভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে চলে যায়। ভবিতব্যতা। বারীন সে-ইঙ্গিতেরও সুযোগ নিলো না।

বারীন মনে মনে বুঝতে পারে, যেন আজ রাত্রিতেই সার্চ্চ হবে। তবুও নিজের মনকে চোখ ঠেরে আদেশ করে, আজ রাত্তিরের মতন যে-যার ঘুমিয়ে পড়...ভোরবেলা দেখা যাবে...

মধ্যরাত্রি।

কাছেই কোন বড়লোকের বাড়ীর দেউড়ীতে রাত্রির ঘণ্টা বাজলো, ঢং ঢং করে তিনবার। • •

বাগানের সামনে রাস্তায় দুজন ঝাঁকা মুটে ঝাঁকা মাথা দিয়ে শুয়ে ছিল। তারা উঠে বসলো।

নিঃশব্দে একজন ইন্‌স্পেক্টর এসে তাদের জিজ্ঞাসা করলো, কেউ বেরোয়নি তো?

—না!

ইন্‌স্পেক্টর পা টিপে পাশের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে।

বাগানের ভেতর একটা ঘরে সারি সারি বিপ্লবীরা শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

পাশেই বারাণ্ডায় একটা আচ্ছাদনের তলায় বারীন শুয়ে আছে।

এমন সময় মস্ মস্ করে পায়ের শব্দ হলো।

বারীন বিছানা থেকে উঠে বসলো। কাণ পেতে শুনলো, যেন বাগানের ভেতরই বহু পায়ের মস্ মস্ শব্দ…

উঠতে যাবে এমন সময় একজন পুলিশ তার বুকের সামনে হাত তুলে বলে উঠলো, Hands up!

বারীন হাত তুল্লো।

সঙ্গে সঙ্গে হুইসিল্ বেজে উঠলো।

অন্ধকারে চারদিক থেকে টর্চ্চের আলো বাগানের মধ্যে ঘুরছে…

সমস্ত বাগান সশস্ত্র পুলিশে ভরে গিয়েছে।

পাঁচিলের ওপর বন্দুক হাতে পুলিশ, দরজায়, বাড়ীর ছাতে… সর্ব্বত্র বন্দুক হাতে পুলিশ।

বারীনকে সার্জ্জেন্ট জিজ্ঞাসা করে,—তোম্ ক্যোন্?

—এই বাগানের মালিক!

সার্জ্জেন্ট আদেশ দেয়,—বাঁধো ইস্কো…

বারীন হাসতে হাসতে সঙ্গীদের ডাকে, ওরে তোরা সব বেরিয়ে আয়…

পুলিশ এক একজনকে ধরে বাইরে নিয়ে আসে।

বারীনকে পিছমোড়া করে বেঁধে বাগানের এক গাছতলায় দাঁড় করিয়ে রাখা হলো আলাদা। দুজন সশস্ত্র পুলিশ দুদিক থেকে সঙ্গীন তুলে তাকে পাহারা দেয়।

বারীন দাঁতে দাঁত দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে…

সার্জ্জেণ্ট বলে, তামাম্ মাটী ঢুঁড়ো…

ধৃত বিপ্লবীদের মুখ থেকে কোথায় কি আছে তার হদিস্ বার করবার জন্যে পুলিশ নানা রকমের যন্ত্রণার আয়োজন করে।

বারীনের দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, আপনার মনে বলে ওঠে, হায় ঠাকুর! সব ভেঙ্গে দিলে। এমনি করে সব ভেঙ্গে দিলে!

পুলিশের কাণ্ড দেখে শৃঙ্খলিত অবস্থায় হেঁকে বলে,…

—ওদের ছেড়ে দাও…ওরা কি জানে? আমিই ওদের দলপতি…আমি সব জানি।

সার্জ্জেণ্ট বারীনের কাছে আসে,…

—Yes, just like a good boy…

এমন সময় পাহারাওয়ালার কণ্ঠস্বর আসে, হুজুর, ইধার নয়া মাটী মালুম হোতা…

বারীন চেয়ে দেখে, যেখানে মাটীর তলায় ট্যাঙ্কে সব পোঁতাছিল, পাহারাওয়ালাটা সেই জায়গাটাই দেখাচ্ছে—

বারীন বলে, Yes, you will find there what you want to find out!

পুলিশ মাটী খুড়তে আরম্ভ করে।

—হুঁসিয়ার…

তারপর গাড়ী করে দলকে দল চালান দেওয়া হলো।

বারীনকে আলাদা একটা গাড়ী করে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় লালবাজারে নিয়ে আসা হলো।

লালবাজার থানায় একটা লোহার পিঁজরা—তার ভেতর দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ বারীন।

একজন সার্জেণ্ট এসে হুকুম দিলো,…

—ডিটেকটিভ অফিস লে যাও!

একজন তরুণ সার্জ্জেণ্ট আর একজন সঙ্গীনধারী পাহারাওয়ালার সঙ্গে বারীন বেরুলো।

জিজ্ঞাসা করলো, কি বাবা, ব্রজে কি পায়ে হেঁটেই যেতে হবে?

পাহারাওয়ালা—হাঁ…হাঁ…নয়তো কি জুড়িগাড়ীতে যাবে নাকি!

দিনের বেলা কলকাতার রাস্তা!

রাস্তা দিয়ে কেরাণীরা অফিসে চলেছে।

হাত-কড়া অবস্থায় খালি পায়ে বারীন, সঙ্গে পাহারাওয়ালা।

উদাসীন জনতা। বারীন সেই প্রথম একান্ত বেদনায় অনুভব করে, তার জীবনের মহাভুল, জনতাকে বাদ দিয়েই তারা আন্দোলন করতে গিয়েছিল, সে জনতা তাদের সম্বন্ধে একেবারে নিস্পৃহ।

ভিড়ের মধ্যে কে একজন তার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করে,…

—কে রে?

—কে আবার? বোধ হয় কোন চোর হবে!

বারীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে! পাহারাওয়ালা ঠেলা মারে।

—আরে, চোল্ চোল্…

কে একজন রসিকতা করে,…

—কি বাবা, বালা পরে যাচ্ছ কোথায়?

আর একজন বলে,—

—কি খন, কোকেন, না, আফিং ?

বারীনের কানে শুধু নিজের অন্তরেরই হাহাকার এসে পৌঁছয়। —এই দেশ ! এদের জন্যে প্রাণ দিতে চলেছি !

ইলিসিয়াম্ রো···

ডিটেকটিভ অফিস। দরজায় সঙ্গীনধারী গুর্খা। সার্জ্জেণ্ট পাস দেখিয়ে বারীনকে নিয়ে প্রবেশ করে।

দোতলার বারান্দার এক কোনে বারীনকে দাঁড় করিয়ে রেখে সার্জ্জেণ্ট ভেতরে ঢোকে।

বারান্দার দেওয়ালের গায়ে একটা ঘড়ি—ঘড়িতে তখন বারোটা বাজে—

সার্জ্জেন্ট বেরিয়ে এসে বলে যায়, খাড়া রহ্ ইধার !

সার্জ্জেণ্ট চলে যায় !

বারীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে একা···

ঘড়িতে একটা বেজে যায়···

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ধরে যায়। বসে···আবার উঠে দাঁড়ায়।

ঘড়িতে দেড়টা বাজে—

দুটো বেজে যায়···

রোদে ঘেমে নেয়ে ওঠে···ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আর দাঁড়াতে পারে না···

এমন মময় ভেতর থেকে রামসদয়বাবু হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসে এবং বারীনকে দেখে বিস্মিত-কণ্ঠে বলে ওঠে,···

—এ কি সর্ব্বনাশ! তোমাকে এই রকম দাঁড় করিয়ে রেখেছে? ছিঃ ছিঃ! এসো বাবা! এসো, এসো…

বারীন নীরবে অনুসরণ করে।

বড় হলঘর!

রামসদয় চেয়ারে বসে।

বারীন টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। রামসদয় একান্ত দুঃখিত কণ্ঠে বলে,…

—ছিঃ ছিঃ ব্যাটাদের কাণ্ডই আলাদা! অকারণে এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে! এ্যাঁ, দেখ দিখি! খাওয়া-দাওয়া বোধ হয় কিছু হয়নি বাবাজীর?

বারীন নীরবে ঘাড় নাড়ে…

রামসদয় তাড়তাড়ি কলিং বেল টেপে। সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক হাজির হয়।

—এই যে রামভরস্…জল্‌দি বাড়ী থেকে খানা নিয়ে আয়…যা …জল্‌দি…জল্‌দি যা…

তারপর বারিনের দিকে চেয়ে বলে—আরে, একি দাঁড়িয়ে আছ কেন বাবা?

নিজে এগিয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে দেয়,…

—বসো…বসো বাবা…তোমরা হলে আমাদের দেশের রত্ন… ফিরিঙ্গী বেটারা কি বুঝবে তার!

এমন সময় একজন সার্জ্জেণ্ট ঘরে ঢোকে! রামসদয় সগর্ব্বে বলে…

—I say Jones…this is Barindra, a jewel of our conntry!

সার্জ্জেণ্ট একটা ফাইল রেখে বক্র কটাক্ষ করে চলে যায়।

রামসদয়ের আতিথেয়তায় বারীন কথা বলবার অবকাশ পায় না।

—পুলিশের চাকরী করি, মুখ আমাদের বন্ধ বাবা…কিন্তু between you and me…সাবাস্…সাবাস্ কাজ করেছ বাবা…এর পর ও ব্যাটারা বলতে পারবে, বাঙালী কাপুরুষ ?

—বাঙালীর এই বদনামই ঘুচোতে চেয়েছি!

তাতো ঠিকই। তবে যা হয়েছে তা…হয়ে গিয়েছে…এখন বাবা, যাতে ভালয় ভালয় তোমরা ছাড়া পাও, তা আমাদের দেখতে হবে এখন… এ পথে বাবা, দেখলে তো, দেশের লোক জাগবে না…

—হাঁ, তা আজ পথেই দেখলাম! লোকে চেনেই না আমাদের …চোর বলে হাততালি দিলো।

—দেবেই…দেবেই…বাঙালীর স্বভাবই এই…মরতে হয়, তুমি মর…ও সব খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি বাবা….তা তুমি, এক কাজ কর বাবা, যা আছে সব ঝেড়ে ফেলে দাও…

—কি বলছেন ?

—যেখানে যা আছে, একটা statement দিয়ে দাও…আবার নতুন করে জীবনযাত্রা আরম্ভ করো…bye the bye রুষ গভর্ণমেণ্ট …হাঁ…হাঁ…আমার কাছে বলতে কোন সঙ্কোচ করো না বাবা…রুষ গভর্ণমেণ্ট কত সাহায্য দিতো ?

—রুষ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের কোন যোগই নেই…

রামসদয় ব্যস্ত হয়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখে, আবার ফিরে আসে।

—ব্যাটা, খাবার আনতে গেল, এখনো ফেরে না…খুব কষ্ট হচ্ছে, না বাবা…? তা, তোমার দাদা, মানে অরবিন্দ ঘোষ…উঃ কত বড় পণ্ডিত, জ্ঞানী লোক…তাঁর কিন্তু এই সব ছেলে-ছোকরার দলে থাকা উচিত হয় নি…

—অরবিন্দও কি গ্রেফতার হয়েছেন ?

—তা বাবা, পুলিশ তো সব খবরই পেয়ে গিয়েছে…তুমি তো সবই জানো…মেদিনীপুরের সত্যেন বসু…আর তার একটা বাচ্চা চেলা …এ্যা…কি…বোস…তাঁর নাম?

—ক্ষুদিরামও কি ধরা পড়েছে?

রামসদয় অট্টহাস্য করে ওঠে…

ওয়েনি রেল ষ্টেশনের বাইরে…ঝড়ো কাকের মত চেহারা ক্ষুদিরামের…চলতে আর পারছে না…তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়ে এসেছে…

সামনেই একটা ছোট দোকান…

মুদীর দোকান।

মুদীর দোকানে দুজন লোক আলাপ করছে…

—বাঙালী ছেলে না হলে এ কাজ আর কেউ করতে পারে?

—কিন্তু…কিংসফোর্ডকে তো মারতে পারল না…বেচারা মেম সাহেব…

ক্ষুদিরাম কৌতুহল দমন না করতে পেরে সোজা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে,…

—কিংস্‌ফোর্ড মরে নি?

অদ্ভুত প্রশ্ন। লোকগুলো তার চেহারা দেখে চমকে ওঠে।

ক্ষুদিরাম নিজের এই অসতর্ক উক্তিতে নিজেই চমকে ওঠে। বুঝতে পারে, কি ভুলই সে করে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি সামলে নেবার জন্যে বলে,…

—তবে যে শুনলুম, লোকে বলছে, কিংসফোর্ড সাহেবের ফিটনের ওপর বোমা পড়েছে…?

একজন লোক বলে, হাঁ ··হাঁ···সে তো ঠিক···কিন্তু সেই ফিটনে সাহেব ছিল না ··একটা মেম আর তার মেয়ে ছিল···

এমন সময় দেখা গেল দুজন গুপ্তচর দোকানের ঝাঁপের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছে।

ক্ষুদিরাম কৃত্রিম দুঃখ দেখিয়ে বলে ওঠে, হায়! হায়! তা···বড় তেষ্টা পেয়েছে···এক গেলাস জল...

মুদী একটা ঘটীতে জল গড়িয়ে নিয়ে আসে। বলে, হাত পাতো!

ক্ষুদিরাম হাত পাতে ··

এমন সময় গুপ্তচর দুজনে এসে মুদীকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। জলের ঘটি পড়ে গেল। দুজন দুদিক থেকে ক্ষুদিরামের হাত জোর করে ধরে ফেলে। ক্ষুদিরাম স্তম্ভিত হয়ে যায়।

একজন জিজ্ঞাসা করে, তুম্ কোন্ হো?

—মুসাফির···

—মুসাফির! বদমাস্···

—এই, জোরসে হাত পাকড়ো···

দোকানীও এক হাত জোর করে ধরে। পুলিশ ক্ষুদিরামের কোমরে হাত দেয়! ক্ষুদিরাম প্রাণপণ চেষ্টা করে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে। কিন্তু পারে না! তাকে মাটির ওপর ফেলে সম্পূর্ণ কাবু করে তার কোমর থেকে রিভলভার বের করে নেয়!

দোকানের লোকগুলো ভয়ে, চীৎকার করতে করতে পালিয়ে যায়···

—আরে, বাবারে···

পুলিশ গর্জ্জে ওঠে,—বদমাস্···শয়তান···

তালা বার করে পিছমোড়া করে তার হাতে কড়া দেয়···

ক্ষুদিরামের চোখে আগুন জ্বলে ওঠে··স্থির হয়ে দূরের দিকে চেয়ে থাকে শুধু···

সমস্তিপুর। পথের ধারে এক পাতকুয়ো।

মেয়েরা জল তুলছে।

এমন সময় প্রফুল্ল হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে উপস্থিত হলো। পায়ে জুতো নেই···কাপড় কাদায় ভরা—গায়ের জামা ছেঁড়া, কাদায় ভরা—

—মায়ি···থোড়া পাণি···

—আও···

প্রফুল্ল আকণ্ঠ জল খেয়ে নেয়।

তারপর নিজের পোষাকের দিকে চেয়ে দেখে। আবার হাঁটতে আরম্ভ করে।

সমস্তিপুরের এক দোকান থেকে একটা কাপড়, জামা আর জুতো কিনে নিয়ে আবার বেরোয়।

নির্জ্জন এক পথের ধারে, ঝোপের ভেতর পুরাণ কাপড় জামা ফেলে দেয়।

সমস্তিপুর ষ্টেশনের টিকিট ঘর।

—মোকামাঘাট!

একখানা ইণ্টার ক্লাশের টিকিট কিনে রেলের কামরায় গিয়ে বসে।

ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর।

ষ্টেশনমাষ্টার আর নন্দলাল মুখোপাধ্যায়। নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটা বেডিং।

—এই যে দারোগাবাবু, বিছানাপত্র নিয়ে? ব্যাপার কি? বদলী হলেন না কি?

নন্দলাল—না ভাই! ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে মজঃফরপুর গিয়েছিলাম···এখন ডেরায় ফিরছি···

—উঃ! কি কাণ্ডটাই হ'য়ে গেল মজঃফরপুরে! কি ব্যাপার বলুন তো?

—ব্যাপার আর কি? বাঙালী ছেলের কাণ্ড! কলকাতার হেডকোয়ার্টর্স আমাদের খবর পাঠিয়েছে···আরে, দুটো সাহেব মারলেই এতো বড় একটা দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে?

—বাঙালী ছেলের কাণ্ড?

—হাঁ হে হাঁ···এই অঞ্চলেই আছে···ধরা পড়লো বলে···এই কুলি···

একটা কুলির মাথায় বেডিং দিয়ে ইন্টার ক্লাশ কামরায় ওঠে। ভাগ্যক্রমে সেই কামরাতেই প্রফুল্ল উঠেছিল।

নন্দলাল দেখে, ছেলেটীর আনকোরা নতুন কাপড়, জামা, জুতো। মনে কেমন খটকা লাগে। গাড়ী চলতে আরম্ভ করে···

প্রফুল্লের জামার পেছনে ছুঁচ দিয়ে সেলাই-করা দোকানের ছাপের কাগজ নন্দলালের চোখে পড়ে।

—জামা বুঝি, এইখান থেকেই কিনলেন?

প্রফুল্ল চমকে ওঠে।

—না···নতুন বটে···কেনা ছিল···অনেকদিনের···

—কোথায় যাচ্ছেন?

—মোকামা ঘাট?

—মোকামাঘাট! কার বাড়ী?

—মানে···কারুর বাড়ী নয়···

নন্দলাল হেসে ওঠে।

—বাড়ী নয়, তো কি মাঠে যাচ্ছেন!

—না, তা নয়···একটু কাজে···আবার সেখান থেকেই ফিরবো···

—ও···, কাজ সেরেই ফিরে যাবেন?

—হাঁ!

প্রফুল্ল অশ্বস্তি বোধ করতে থাকে।

নন্দলাল জিজ্ঞাসা করে—ব্যাপার শুনেছেন?

—কি?

—মজঃফরপুরে…

—হাঁ…

—সত্যি, বাঙালী বলে পরিচয় দিতে গর্ব্ব বোধ হচ্ছে!

—কেন?

—আরে, এ তো বাঙালী স্বদেশী ছেলেদের কাজ!

—তা আপনি কি করে বলতে পারেন?

—মাণিকতলায় বোমার আড্ডায় বারীন ঘোষ…অরবিন্দ ঘোষ সব ধরা পড়েছে…সারা ভারতবর্ষে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে…পুলিশ বলছে তারা প্রমাণ পেয়েছে·এ বারীন ঘোষের দলেরই কাজ! ঘুমন্ত ভারতবর্ষে বাঙালীর ছেলেই ঘুম ভাঙ্গাবে!

প্রফুল্ল সে-সংবাদে চমকে ওঠে। যন্ত্রচালিতের মতন ঘাড় নেড়ে বলে—বাঙালীর ছেলে! হাঁ…হয়ত তাই…

—হয়ত নয়…আপনি দেখে নেবেন…এই বাঙালীর ছেলেই অসাধ্য সাধন করবে…নইলে এই মাটিতে বিবেকানন্দ জন্মায়?

প্রফুল্ল শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টিতে লোকটীর দিকে চায়। ভাবে লোকটী হয়ত সত্যিকারের কোন দেশপ্রেমিক। অন্য কথা আনবার জন্যে প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করে,…

—মাফ করবেন, আপনি কি করেন?

—সে অনেক কথা…পুলিশে কাজ করতাম…এই বন্দেমাতরমের জন্যেই কাজ যায়! সেদিন থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, মুটেগিরি করতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আর গোলামী করবো না!

—আপনার মতন যদি সব বাঙালী ভাবতো!

—ভাববে…একদিন নিশ্চয়ই ভাববে…আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

—আমি…এজেন্সীর কাজ কি না…পাঁচ জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে চলেছি…

—আপনার কাপড়টাও দেখছি একেবারে কোরা কাপড়… জুতোটাও নতুন…জামা তো নতুনই দেখছি…ব্যাপারটা কি বলুন তো ?

—কেন, আপনি কি এর আগে এই রকম কাপড় জামা পরতে দেখেন নি ?

—দেখবো না কেন ? তবে, তিনটে জিনিসই একেবারে নতুন কি না… বিয়ের দিন বাঙালী ছেলের অঙ্গে এই রকম এক সঙ্গে সব নতুন শোভা পায়।

নন্দলাল হেসে ওঠে।

প্রফুল্ল হাসতে পারে না।

—তা ভাই, যদি কোন দিন এই পথে আবার আসো, এই মোকামাঘাটে আমার বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে উঠতে পার…এই নাও আমার ঠিকানা…নন্দলাল একটা কার্ড দেয়।

প্রফুল্ল কতকটা আশ্বস্ত হয়।

নন্দলাল তাকে ভাল করে লক্ষ্য করবার জন্যে ঘুমোবার ভান করে। বলে—একটু ঘুমোবো ভাই…তুমি আমার বেডিংটার দিকে একটু নজর রেখো কেমন ?

—আচ্ছা ! আপনি নিশ্চিন্তে শুন !

নন্দলাল শুয়ে পড়ে।

কিন্তু সারাক্ষণ আড়চোখে প্রফুল্লকে লক্ষ্য করতে থাকে।

প্রফুল্ল জামার পেছন দিক থেকে টিকিটটা হাতড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে।

সেই অবকাশে হঠাৎ কোমরে রিভলভারটা আংশিক দেখা যায়। নন্দলাল আশ্বস্ত হয়ে নাক ডাকার ভাণ করে।

ফেরী ঘাট।

ষ্টীমারে প্রফুল্ল আর নন্দলাল উঠছে…

মোকামাঘাট…

ষ্টীমার থেকে নন্দলাল আর প্রফুল্ল নামে।

কোথাও একটা কুলী দেখা যাচ্ছে না।

নন্দলাল হাঁকে, কুলী…কুলী…

কোন কুলী আসে না।

প্রফুল্ল বলে, কিছু মনে করবেন না, চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি…

—তা, কি করে হয়! তা কি ভাল দেখায়!

—তাতে কি হয়েছে! আমি Young man!

—তা…চলুন!

নন্দলাল দেখলো, সেটা সুবিধাই হবে। প্রফুল্ল নন্দলালের বেডিং ঘাড়ে নিয়ে এগিয়ে চলে।

প্ল্যাটফর্ম্মে।

নন্দলাল বলে, একটু দাঁড়াও ভাই, আসছি!

নন্দলাল তাড়াতাড়ি ষ্টেশন মাষ্টারকে বলে, Immediately আপনার যত পুলিশ আছে…

প্রফুল্ল বেডিং নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নন্দলাল ফিরে আসে।

প্রফুল্ল বলে, আমি তাহলে টিকিটটা কিনে আনি!

—বেশ!

টিকিট ঘর।

প্রফুল্ল— একখানা হাওড়ার টিকিট !

টিকিট নেয়।

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে দুজন পুলিশ তাকে জড়িয়ে ধরে।

নন্দলাল হুকুম দেয়, পাকড়ো…জোরসে পাকড়ো…

হঠাৎ প্রফুল্ল বুঝতে পারে সব। অসহায় আক্রোশে নন্দলালের দিকে চেয়ে বলে ওঠে, ছি…বাঙালী হয়ে এই আপনার কাজ ?

প্রফুল্ল ছুটে বাইরে বেরিয়ে পড়বার শেষ চেষ্টা করে।

চারদিক থেকে দশ বার জন পুলিশ ঘিরে ফেলে।

পালাবার আর কোন পথ না দেখে, প্রফুল্ল কোমর থেকে তাড়াতাড়ি রিভলভার বার করে নিজের মুখের কাছে ধরে, চীৎকার করে বলে ওঠে—বন্দেমাতরম্ !

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আওয়াজ করে দু'বার রিভলভার গর্জ্জে ওঠে।

আলীপুরের জেলের ফটক।

পা মেপে মেপে শান্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছে…

ওপরের ক্লক টাওয়ার থেকে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে…

কারাগারের ভেতর বন্দী আসামীদের সভা বসেছে। বারীন মধ্যস্থলে।

বারীনের সামনে নরেন গোঁসাই, বাঁ পাশে, সত্যেন আর কানাইলাল।

ডান দিকে অন্য এগারোজন বন্দী।

বারীন বলে, আজই রামসদয় বাবুকে জবাব দিতে হবে, Confession করবো কি না…সেই জন্যেই আমাদের এই সভা করবার Special permission দেওয়া হয়েছে…

দেখা গেল, রামসদয় বাবু আড়াল থেকে সব শুনছেন।

সবাই এক রকম রাজী হয়। কিন্তু হেমচন্দ্র কিছুতেই রাজী নয়। নরেনের দিকে চেয়ে হেম বলে, আমার মতে কিছুতেই Confession করা হবে না…কি বলো নরেন?

নরেন—কিছুতেই নয়!

বারীন—আজ যিশুখৃষ্টের মতন বলতে ইচ্ছে করছে, আমাদের মধ্যে কেউ শেষকালে বিশ্বাসঘাতক হবে কি না…আমাদের নিজেদের জন্যে ভাবিনা…ভাবছি শুধু অরবিন্দের জন্যে…তাঁকে ওরা আমাদের সঙ্গে জড়িয়েছে। আমরা যাই আর থাকি, তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু অরবিন্দকে বাঁচাতেই হবে…তিনি হলেন বীজ…প্রাণবীজ…সে-বীজ রক্ষা হলে জাতি রক্ষা হবে…তাই আমি ঠিক করেছি, আমি নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ নিয়ে Confession করবো।

হেম—তবুও না…

বারীন—আমি বুঝেছি এ পথে হবে না…আমি যদি Confession না করি, তাহলে অকারণে আরো বহুলোক নির্য্যাতিত হবে…

হেম—তাতে কি যায় আসে?

এমন সময় রামসদয় হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে,…

—এই যে, তোমরা বোধ হয় এখনো কিছু decide করে উঠতে পারো নি…বেশ তো…think clearly…হেম…তুমি এসো তো আমার সঙ্গে…আমি হেমকে সব বুঝিয়ে বলছি…কতকগুলো জিনিষ দেখাচ্ছি, তাতেই হেম বুঝতে পারবে…

রামসদয় হেমকে নিয়ে চলে যায়…

রামসদয়বাবুর নির্দ্দেশে পুলিশ হেমকে দল থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্র কক্ষে বন্ধ করে রেখে দেয়।

রামসদয়ের অফিসে।

রামসদয় একজনকে বলে যাচ্ছে, আর সে লিখছে—পুলিশের হাতে

যে সব record পৌঁছিয়েছে, তাতে আমাদের এখন confess করা ছাড়া আর উপায় নেই। সেই জন্যে আমি আমার মত পরিবর্ত্তন করলাম…ইতি হেমচন্দ্র। বেশ এই সই…ভাল করে দেখে সই করো…Hemchandra Kanongui…

রামসদয় হেমচন্দ্রের জাল-স্বীকারোক্তি তৈরী করে।

ওধারে বন্দীদের সভায় তখন জোর আলোচনা চলেছে।

নরেন—অবশ্য, তুমি যে confession করবে, তাতে পুলিশ সত্যিকারের evidence বিশেষ কিছুই পাবে না…

বারীন—অথচ অনেক কর্ম্মী বেঁচে যাবে…দায়িত্ব আমার…সাজা যা কিছু আমিই নেবো…

সত্যেন—এতো নিরুৎসাহ হচ্ছো কেন? হয়ত আমরা fail করেছি…কিন্তু কে বলতে পারে, এই failure থেকেই হয়ত জন্মাবে, ভারতের মুক্তির পথ। আমাদের ব্রত…জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আমরা পালন করে যাবো…এবং সেই ব্রত-পালনের মধ্যেই বাঙালী ছেলে একটা নতুন আদর্শের সন্ধান পাবে…তারা বুঝবে, বোমার চেয়ে বড় জিনিষ হচ্ছে, চরিত্র!

কানাই—বাঙালী ছেলের মধ্যে এই চরিত্রের বোধকে জাগিয়ে যাওয়া…এই হলো এখন আমাদের শেষ কাজ…তার জন্যে আমাদের মৃত্যুকে আমরা যতদূর পারি, মহিমান্বিত করে যাবো!

এমন সময় একটা কাগজ হাতে রামসদয় প্রবেশ করে,…

—এই দেখো, তোমরা বলো হেমচন্দ্র স্বীকার করবে না, এই দেখো সে স্বীকার করেছে।

সবাই মুখ-চাওয়াচায়ি করে। বারীন সইটা একবার দেখে নিয়ে বলে, দিন, আপনার কলম…আমিও ঐখানে সই করে দিচ্ছি, আমি confess করবো…

তাড়াতাড়ি রামসদয় কলম বার করে দেয়।

বারিন নাম সই করে…

প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত।

ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষুদিরামের death-warrant এ সই করছেন…

মুহুরী উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে—

—Khudiram Bose to be hanged until he dies !

সমস্ত আদালত নীরব।

ক্ষুদিরাম জজের দিকে না চেয়ে এক দৃষ্টিতে দেখছে, দেওয়ালে একটা টিকটিকি মাছি ধরবার চেষ্টা করছে…

জজ ক্ষুদিরামকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন ইংরাজীতে…মুহুরী তা বাংলা করে বলে,…

—তোমার প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হলো, তা বুঝেছো ?

ক্ষুদিরাম হেসে বলে, হাঁ।

আবার ঘাড় ফিরিয়ে সেই গিরগিটীর দিকে চায়।

আদালত শুদ্ধ লোক অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। সমস্ত আদালত সেই নির্লিপ্ততা দেখে ক্ষণিকের জন্য নীরব হয়ে যায়।

বিচারক—আপীল বা অন্য কিছু সম্বন্ধে বলতে কি চাও ?

সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে ক্ষুদিরাম বলে,—না…কিছু না…

তারপর হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে যায়। বলে ওঠে,…

—হাঁ, হাঁ, একটা কথা…এখানে সকলের সামনে আমি শুধু একটা কথা বলে যেতে চাই।

বিচারক—অন্য বাজে কথা বলবার আর সময় নেই…

—বাজে নয় দরকারি…

—জেলে গিয়ে সুপারিণ্টেডেন্টকে বলো—

—না…না…এখানে আদালতে…সকলের সামনে বলতে চাই… আমাকে যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি জানিয়ে যেতে চাই, কি করে বোমা তৈরী করে…

বিচারক তাড়াতাড়ি হুকুম দিলেন—নিয়ে যাও!

পাহারাওয়ালা তাড়াতাড়ি কাঠগড়া থেকে ক্ষুদিরামকে নিয়ে যায়!

অন্ধকার কারাকক্ষ।

বাইরে শুধু একটা লণ্ঠনের আলো জ্বলছে।

ক্ষুদিরাম আপনার মনে গাইছে,—

"মাগো যায় যাবে জীবন চলে
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
বন্দেমাতরম্ বলে!

গান শেষ হলে সেলের দরজা প্রহরী খুলে দিল। একজন বাঙালী ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন,…

ক্ষুদিরাম!

কে! কালিদাস বাবু…নমস্কার!

ক্ষুদিরাম…কাল রাত্রি-শেষে…তোমার…

কালিদাস বাবুর চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে।

মৃত্যুপথযাত্রী শান্ত কণ্ঠে বলে,…

—কাঁদছেন কেন কালিদাস বাবু, কৈ আমি তো কাঁদছি না! জানেন, এই একখানি বই…

এই বলে অন্ধকারে ছোট্ট একখানি গীতা তুলে ধরে,…

—এই "গীতা"…এই আমাদের শিখিয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্র…মৃত্যুকে আমার কি ভয়?

কালিদাস—তোমার কি কোন শেষ ইচ্ছা আছে, যা পূরণ করতে পারি।

—হাঁ…আমার ইচ্ছে…মা চতুর্ভুজার প্রসাদ খেয়ে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো!

—তাই হবে…

২৬শে শ্রাবণ…

ভোর-রাত্রি…

ক্ষুদিরাম হাত বাড়িয়ে একটা পাত্র থেকে, মার প্রসাদ মুখে দিয়ে প্রণাম করে! মথিত, শান্তকণ্ঠে, মন্ত্র উচ্চারণের মত বলে

—কালী…কালী…কালী…

একজন সাহেব সার্জ্জেণ্ট বলে—

—Time's up…

—আমিও প্রস্তুত…

জল্লাদ এসে চোখে কাপড় বেঁধে দেয়।

দুধারে নীরব সশস্ত্র শান্ত্রীরা দাঁড়িয়ে। তার ভেতর দিয়ে ক্ষুদিরাম এগিয়ে চলে…

সামনেই ফাঁসীর মঞ্চ…

তার চারিদিকে পুলিশ অফিসর, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট নীরবে দাঁড়িয়ে…

জজ এগিয়ে ফাঁসীর হুকুম পড়েন…

ক্ষুদিরাম তখন অন্যমনস্কভাবে ফাঁসীর রজ্জু অনুভব করে দেখছিল।

জজের পড়া শেষ হয়ে গেল, সে বালকের মতন জল্লাদকে জিজ্ঞাস করে ওঠে…

—আচ্ছা ভাই, ফাঁসীর দড়িতে মোম মাখাও কেন?

জল্লাদ কোন উত্তর দিতে পারে না।

ক্ষুদিরাম ধীরে ফাঁসীর মঞ্চে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

জল্লাদ গলাতে দড়ি পরাতে যায়।

ক্ষুদিরাম নিজেই নিয়ে নেয়।

এক সেকেণ্ড দাঁড়ায়।

উর্দ্ধে দুই হাত তুলে প্রণাম করে, একবার শুধু বলে, বন্দেমাতরম্।

তারপর নিজেই গলায় ফাঁস দিয়ে নেয়…

কাঠ সরে যাওয়ার শব্দ হয়।

আলিপুরের আদালতের কাঠগড়া,…

হাতের ছেকল বাজিয়ে উল্লাসকর প্রকাশ্য আদালতে গাইছে—

"সার্থক জনম মাগো
তোমায় ভালবেসে…"

জজ বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে হাতের দণ্ড ঠুকে চেঁচিয়ে ওঠেন, Stop....Stop....

বন্দীরা তা ভ্রুক্ষেপ করে না,…

সকলে সমস্বরে আবার গাইতে আরম্ভ করে…

জজ বিরক্ত হয়ে থামতে আদেশ করেন।

গণ্ডগোলের মধ্যে দেখা গেল, একজন উকীল আসামীদের অনুরোধ করতে তাদের নিকটে গেল, বারীন তাঁর হাতে গোপনে একটা কাগজ গুঁজে দিল…

উকীলটী তাদের শান্ত হবার আবেদন করে ফিরে এলেন এবং ভিড়ের মধ্যে একটী ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল তার হাতে সেই কাগজটি গুঁজে দিলেন।

ছেলেটী তৎক্ষণাৎ আদালত থেকে বেরিয়ে গেল সংগোপনে। এক নির্জ্জন রাস্তার কোণে ছেলেটী কাগজখানি পড়ে দেখে, বারীনের লেখা, এখানে দেখা করবার জন্যে লোকজন আসছে…এই সুযোগ…যা পার কিছু ভাল আম অবশ্যই পাঠাবে দেরী করো না।

সরকার পক্ষের উকীল উঠে দাঁড়িয়ে জানান, হুজুর, আসামীদের মধ্যে একজন এপ্রুভার হয়েছে…তার জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে এবং পুলিশ সেই জবানবন্দী যাচাই করবার জন্যে সময় চাইছে…

কাঠগড়া থেকে আসামীরা হৈ চৈ করে ওঠে।

বিচারক আবার দিন ফেলেন। আদালত ভেঙ্গে যায়।

কারাগারে তিন নং ওয়ার্ড।

তিনটী ঘর, দুপাশে দুটী ছোট ঘর, মাঝখানে একটা হলঘর, সামনে পাঁচিল ঘেরা খানিকটা উঠোন। উঠোনের বাইরে অদূরে জেলের পাঁচিল!

হলঘরে আসামীরা সকলে মিলে পরামর্শ করছে।

তার মধ্যে সত্যেনকে দেখা গেল, মাঝে মাঝে হাঁফানীতে কষ্ট পাচ্ছে।

চাপাগলায় তারা পরামর্শ করছে। বারীন জেল ভেঙ্গে পালাবার একটা প্ল্যান করেছে এবং তারি জন্যে বাইরে থেকে রিভলভার জোগাড়ের চেষ্টা চলেছে।

চোখে চশমা একটী কালো মতন ছেলে, অধিকাংশ সময় নীরব থাকে, কানাইলাল, জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু নরেনের ব্যবস্থা?

বারীন বলে, কানাই, আমার কথা শোন…জেলের ভেতর তাকে মারবার তুমি যে কথা বলছো, তা করতে গেলে, আমার জেল ভেঙে পালানোর স্কীম নষ্ট হয়ে যাবে…তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, আমি

বাইরের কর্ম্মীদের খবর পাঠিয়েছি...আদালতে ইসারায় তারা আমাকে জানিয়েছে...তারাই নরেনের ব্যবস্থা করবে...

কানাই বলে, কিন্তু যত দেরী হয়ে যাবে, ততই মুস্কিল...তার জবানবন্দীর ফলে ইতিমধ্যেই হয়ত বহু নিরীহ কর্ম্মী নির্য্যাতিত হচ্ছে ...বাইরের সমস্ত আড্ডা নষ্ট হয়ে যাবে...

বারীন অবশেষে দলপতির অধিকারে বলে, জেলে হলেও, আমি তোমাদের দলপতি, আমার হুকুমই শেষ কথা...এ নিয়ে আর তোমরা মাথা ঘামাবে না...

রাত্রি বেলা, পাশের ছোট সেলের ভেতর। চারজন লোক শুয়ে।

তার মধ্যে সত্যেনকে দেখা গেল হাঁপানীর জ্বালায় উঠে বসলো।

সঙ্গে সঙ্গে কানাই উঠে বসলো।

দুজনে এক কোণে সরে এলো।

অপর দুজন তখন ঘুমুচ্ছে।

তারা দুজনে চুপি চুপি কি পরামর্শ করে।

—কোন কাজই করতে পারলাম না। শুধু মিছিমিছি জেলে পচতে এলাম। তাই স্থির করেছি, যে যাই বলুক, এই জেলের ভেতরই নরেনকে সরাতে হবে...বাংলা দেশে এমন একটা উদাহরণ রেখে যাবো, যাতে কেউ আর বিশ্বাসঘাতক না হতে পারে...

—আমিও রাজী!

—নরেনকে সরিয়ে য়ুরোপীয়ান্ ওয়ার্ডের হাঁসপাতালে রেখেছে... তুইও হাঁপের বাড়াবাড়ি দেখিয়ে হাঁসপাতালে bed নে এবং গোঁসাইএর সঙ্গে আলাপ জমা যে তুইও approver হবি...

—অস্ত্র?

—দুটো রিভলবার তো জোগাড় হয়েছে···বারীন উঠোনের ইট সরিয়ে তার তলায় রেখেছে, তার জেল ভেঙ্গে পালাবার চক্রান্তের জন্যে···চোরের ওপর বাটপাড়ি হবে···

এমন সময় ঘুমন্ত বন্দীদের মধ্যে একজন নড়ে উঠে···

কানাই আর সত্যেন তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়ে শোয়।

সকালবেলা দেখা গেল, সত্যেনের হাঁফের ভয়ানক বাড়াবাড়ি···

ডাক্তার এলো···

হাঁসপাতালের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

হাঁসপাতালে ডাক্তার সত্যেনকে শুইয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই, সত্যেন তার হাত ধরে টানে···

—কি ব্যাপার ?

সত্যেন এ-দিক ও-দিক চেয়ে, ডাক্তারের কানে কানে বলে, আমার দল ছেড়ে হাঁসপাতালে আসার একটা উদ্দেশ্য আছে—

—কি ?

—আমি আর সহ্য করতে পারছি না···

—সত্যিই তো আবেগের মাথায় একটা কাজ করা....এখন জীবন নিয়ে টানাটানি···

—আপনি গোঁসাইকে আমার কাছে আনতে পারেন ?

—কেন ?

—আমিও এপ্রুভার হবো···তাই তার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই···দুজনে দু'রকম বলা তো চলবে না···

—ঠিক কথাই তো···আমি এক্ষুনি সুপারিন্টেডেন্টকে বলছি···

—কিন্তু—দেখুন···একটা অনুরোধ··এখন যেন দলের কেউ না জানতে পারে···

—আরে রাম ! আমি আর কাউকে বলছি না···

একজন য়ুরোপীয় সার্জ্জেণ্টের সঙ্গে হাঁসপাতালের য়ুরোপীয় কয়েদীর পোষাকে নরেন সত্যেনের সঙ্গে দেখা করতে আসে।

সঙ্গে বৃদ্ধ জেলার যোগেন বাবু।

যোগেনবাবু মহা খুশী।

—যা হবার তো হয়ে গিয়েছে বাবা! এ করে কি কিছু লাভ হবে?

সত্যেন বলে, লাভ অলাভ জানি না, আমি বাঁচতে চাই…এ ভাবে পচে মরতে পারবো না…

নরেন বলে, সত্যি কিছু করলুম না…অথচ ফাঁসীতে প্রাণটা দেবো? বাবা সমস্ত বন্দোবস্ত করেছেন—মামলা হয়ে গেলেই বিলেত চলে যাবো…

সত্যেন বলে, আমরা দুজনে একটু পরামর্শ করতে চাই…

—বেশ তো…বেশ তো…সে তো বটেই…দুজনের statement যেন contradictory না হয় তা দেখতে হবে বৈ কি…তা তোমরা পরামর্শ করো…

যোগেন বাবু চলে যান!

ভোর বেলা দেখা গেল কানাইলাল একা উঠোনের এক কোণ থেকে একটা ইট সরিয়ে একটা রিভলভার বার করে নিলো। সেটাকে ভাল করে কোমরে লুকিয়ে রাখলো। তারপর ঘরের ভেতর কম্বলের তলায় রেখে দিলো।

বেলা হলে ডাক্তারের কাছে খবর এলো আসামীদের মধ্যে একজন পেটের যন্ত্রণায় বিশেষ কষ্ট পাচ্ছে।

ডাক্তার এসে দেখে, কানাইলাল ছটফট করছে…

হাঁসপাতালের ব্যবস্থা হয়।

ডাক্তার ষ্ট্রেচার আনতে আদেশ করেন।

কানাইলাল সেই ফাঁকে কম্বলের ভেতর থেকে রিভলভারটা কোমরে নিয়ে ষ্ট্রেচারে শোয়…

হাঁসপাতালে সত্যেনের বেডের পাশে তার বিছানা হয়।

কানাই কিছু-জানে-না এই রকম ভাব দেখিয়ে বলে, তোর হাঁফ খুব বেড়েছে বুঝি? চল্ ফিরে সেলে—

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলে, ওকে এখনো দু একদিন থাকতে হবে.... তোমাকে আমি এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি—দেখি পেটটা আর একবার…

কানাইলাল মুখ বিকৃত করে বলে, উঃ…বড্ড বেগ পাচ্ছে ডাক্তারবাবু…

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলে—এই যে পাশেই কমঠ রয়েছে…

ডাক্তার সত্যেনকে বলে, জেলের খাবার সহ্য হবে কেন?

—আপনি একটু বারান্দায় যেতে পারেন, আমি একবার কানাইকে sound করে দেখতাম…

—All right…All right…

ডাক্তার বেরিয়ে যায়।

বারান্দায় সশস্ত্র শাস্ত্রী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সত্যেন বিছানা থেকে উঠে lavatoryর দরজায় টোকা মারে, হলো? ডাক্তারবাবু তোর জন্যে বারাণ্ডায় অপেক্ষা করছেন....

কানাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে রিভলভারটা সত্যেনের হাতে দিয়ে দেয়।

সত্যেন কোমরে গুঁজে নেয়।

তারপর বিছানায় দুজনে বসে চুপি চুপি কি কথা বলে।

ডাক্তার ফিরে আসে।

—কেমন… এখন কেমন feel করছো?

কানাই বলে,—ভালই…আমি cell-এ ফিরে যাবো…

—বেশ…

শান্ত্রীকে ডেকে কানাইলালের সঙ্গে দেয়। একটা রিভলভার চলে আসে সত্যেনের কাছে।

পরের দিন সত্যেনের ঘর…

নরেন উপস্থিত…

সার্জ্জেন্ট দরজায় দাঁড়িয়ে…

জেলার যোগেনবাবু প্রবেশ করে,….

—তোমাদের আলোচনা হলো ?

সত্যেন বলে, দেখুন, লিখে একটা খসড়া তৈরী করতে হবে… দুজনে একসঙ্গে বসে লিখে ফেলবো কাল…আলোচনা যা করবার হয়ে গিয়েছে…

—বেশ তাই হবে…

সন্ধ্যার অন্ধকারে।

তিনজন বন্দী কানাইকে আড়াল করে দাঁড়ায়।

কানাই তাদের আড়ালে উঠোনের ইট সরিয়ে দ্বিতীয় রিভলভারটী বার করে নেয়।

রাত্রিতে সবাই ঘুমুচ্ছে।

কানাই একা জেগে বসে।

ওপরের জানলা থেকে তার পায়ের সামনে এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে…

সকাল বেলা।

হাঁসপাতালের সিঁড়ির তলায় কানাইলাল দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজছে।

সত্যেনের ঘরে।

সার্জ্জেন্ট হিগিন্স্ নরেনকে পৌঁছে দিয়ে পাশের ঘরে কি কাজে চলে যায়…

নরেন কাগজ বার করে।

বলে,—কাল রাত্তিরে আমি খানিকটা নিজে লিখে রেখেছি…

সত্যেন পকেটে হাত দেয়।

—এক মিনিট…

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে কানাইলাল প্রস্তুত…

দুজনে চোখে চোখে কথা হয়ে যায়…

সত্যেন ঘরের ভেতর ঢুকে নরেনের সামনে গিয়ে হঠাৎ পকেট থেকে রিভলভার বার করে চীৎকার করে ওঠে, দেশদ্রোহী… বিশ্বাসঘাতক…

নরেন লাফিয়ে দরজা দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে…সত্যেন তার পেছনে পেছনে তাড়া করে…একটী গুলি তার পায়ে লাগে…

প্রাণের মায়ায় সিঁড়ি দিয়ে উঠোনে এসে ছুটতে আরম্ভ করে,…

—মেরে ফেল্লে…মেরে ফেল্লে…

কানাই নীচেই প্রস্তুত হয়েই ছিল!

সঙ্গে সঙ্গে সে রিভলভার বার করে নরেনকে তাড়া করলো। একটা বাঁকে তারা দুজনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুর্বল কংকালসার দেহ নিয়ে সত্যেন সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে কাউকে দেখতে না পেয়ে একজন কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ দিকে গেল ?

তখন জেলের মধ্যে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে…

পাগলা ঘন্টি বাজতে সুরু করেছে…

চারদিক থেকে সশস্ত্র প্রহরী ছুটে আসছে…

কোন দিকে লক্ষ্য না করে সত্যেন আর কানাই শুধু নরেনকে লক্ষ্য করে ছুটে চলে…আর তাদের গুলির আওয়াজে বাতাস কেঁপে-ওঠে…

সামনে বৃদ্ধ জেলার…এগিয়ে আসতে ভয়ে তাঁতশালার তাঁতের ভেতর লুকিয়ে পড়েন।

ডাক্তারবাবু একটা বেঞ্চের তলায় পড়ে যান…

সত্যেন আর কানাই নরেনকে তাড়া করে একটা নর্দ্দমার দিকে নয়ে যায়…

আর একটা গুলিতে সে ঘুরে নর্দ্দমার ধারে পড়ে যায়…

সত্যেন আর কানাই সেই নর্দ্দমায় পতিত দেহের ওপর, গুনে গুনে তাদের রিভলভারের যত গুলী ছিল বর্ষণ করে…

—এমনিভাবে দেশদ্রোহী মরে…

—মীরজাফর উমিচাঁদের বংশধর যেন কেউ আর বাংলায় না থাকে…

তারপর রিভলভার ফেলে দিয়ে বলে, finished !

সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিক থেকে শান্ত্রীরা তাদের ধরে ফেলে। কোন বাধা তারা দেয় না।

আবার আদালত।

শৃঙ্খলবদ্ধ-হস্ত কানাইলাল আর সত্যেন্দ্রনাথ।

বিচারক আর বন্দীর মাঝখানে যেন ছায়াতে ফাঁসীর রজ্জু দুলছে…

একবার কানাই-এর কাছ থেকে আর একবার সত্যেনের গায়ের ওপর দিয়ে ছায়ারজ্জু যেন যাতায়াত করছে, বিচারক কানাইলালের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন,…

—তোমার কিছু বলবার আছে ?

—না…আগেও যা বলেছি, এখনো তাই বলছি…নরেন গোঁসাই-এর হত্যার জন্মে আমি একা দায়ী! নরেনের গায়ে যত গুলী ছিল, সবই আমার রিভলভারের—

সত্যেনের দিকে ফিরে বিচারক জিজ্ঞাসা করেন,…

—তোমার কিছু বলবার আছে ?

—না, আগেও যা বলেছি, এখনো তাই বলছি, নরেন গোঁসাই-এর হত্যার জন্মে আমি একা দায়ী…নরেনের গায়ে যত গুলী ছিল… সবই আমার রিভলভারের…

বিচারক…Both of them to be hanged until they die…

দোদুল্যমান ছায়ারজ্জু…মাঝপথ থেকে দুটো হয়ে যায়…

একটা সত্যেনের গলায় গিয়ে লাগে

আর একটা কানাই-এর গলায় আটকে যায়…

তাদের কণ্ঠ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে রজ্জু রূপান্তরিত হয়ে যায় পুষ্পমালায়।

আলীপুরের ঐতিহাসিক বোমার মামলার প্রধান আসামী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

যেদিন পুলিশ মুরারীপুকুর বাগানে হানা দেয়, সেদিন শেষ রাত্রিতে তারা গ্রে ষ্ট্রীটে শ্রীঅরবিন্দের বাড়ীতেও উপস্থিত হয়।

রিভলভার হাতে তুলে ধরে পুলিশ সুপার ক্রেগান সাহেব যখন শ্রীঅরবিন্দের ঘরে এসে ঢুকলেন, তখন দেখলেন, একজন অতি সাধারণ লোক মাটিতে একটা পুরাণো মাদুরে শুয়ে আছে। তিনি এসেছেন ভারতের সব চেয়ে দুরন্ত ডাকাতদলের সর্দ্দারকে ধরতে, না জানি সে কি ভয়ঙ্কর লোক হবে? কিন্তু ছেঁড়া মাদুরে সেই অতি-সাধারণ লোকটীকে দেখে তাঁর বিশ্বাস করতে রীতিমত কষ্ট হলো যে, এই অরবিন্দ।

তাই তিনি প্রশ্ন করলেন, শুনেছি আপনি নাকি শিক্ষিত, বি-এ পাস করেছেন...তবে এই রকম জায়গায় এই ছেঁড়া মাদুরে এরকম দীনহীন নোংরা ভাবে থাকতে আপনার লজ্জা করে না?

শ্রীঅরবিন্দ গম্ভীরভাবে জবাব দেন, আমি গরীব, তাই গরীবের মতই থাকি।

সাহেব যেন এতক্ষণে ভেতরের রহস্য বুঝতে পারেন। তাই বলে ওঠেন, তাই বুঝি ডাকাতি করে রাতারাতি বড়লোক হতে গিয়েছিলেন?

শ্রীঅরবিন্দ জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না।

ন' ফুট লম্বা আর পাঁচ ফুট চওড়া একটা গর্ত্ত, জেলের কারা-কক্ষ। কোন জানালা নেই, কোন ছিদ্র নেই। সেই একই ঘর, বা গর্ত্ত শোবার ঘর, পায়খানা, সব। সেইখানে দীর্ঘ এক বৎসর কাল অরবিন্দকে বিচারের অপেক্ষায় কারা-ভোগ করতে হয়।

এই মামলা আর তার বিচার আদালতের নথী থেকে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। প্রত্যেক বাঙালীই আজ তার সঙ্গে পরিচিত।

যে-আন্দোলনের নায়ক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, এই কারা-কক্ষ থেকে সে-আন্দোলনের সঙ্গে তিনি বিচ্যুত হয়ে পড়েন। বাংলার তথা

ভারতের রাজনৈতিক অভিব্যক্তির ধারা এই কারা-কক্ষ থেকে তাঁকে এড়িয়ে স্বতন্ত্র পথে অগ্রসর হয়।

অন্য আর এক-নায়কের আগমনের জন্যে তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়। সে নায়ক মহাত্মা গান্ধী।

কিন্তু যে আদি রহস্য শ্রীঅরবিন্দকে এই আন্দোলনে আকৃষ্ট করে আনে, এই আন্দোলনের আড়ালে শ্রীঅরবিন্দের মনে সে তার কাজ করে চলেছিল। যে বৃহত্তর সমস্যার অঙ্গস্বরূপ শ্রীঅরবিন্দ স্বজাতির রাজনৈতিক সংগ্রামে নিজেকে লিপ্ত করেন, সে সমস্যা সমাধানের কথা তাঁর মন থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বিলুপ্ত হয় নি। কারাকক্ষের নির্জ্জনতায় সে আবার তার দাবী নিয়ে উপস্থিত হলো। Perseus the Deliverer নাট্যকাব্যে তাঁর অন্তরে যে মহা-জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে এবং সেদিন কাব্যের ক্ষেত্রে কবি-কল্পনায় সেই মহা-জিজ্ঞাসার যে উত্তর তাঁর মনে তিনি পেয়েছিলেন, Man shall attain his godhead ! আজ এসেছে লগ্ন, জীবনের প্রত্যক্ষ সাধনায় সেই মহাসত্যকে উপলব্ধি করার। এই যে মানুষের চিরদিনের কল্পনার স্বপ্ন, যুগে যুগে এই যে অমর আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন মহাপুরুষেরা, মহাসাধকেরা, একি শুধু কল্পনাই থেকে যাবে? এর মধ্যে কি বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা নেই? এ কি শুধু একজন মহাপুরুষের ব্যক্তিগত মুক্তির কাহিনী? সমগ্র মানব-সমাজের প্রতিদিনের জীবনে নেই কি এর কোন বাস্তব সংযোগ? মানব-ইতিহাসের এই চরমতম দুর্জ্জেয় প্রশ্ন-কারা নির্জ্জনতায় তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেল্লো।

একদিন কবিতার মধ্যে এই চরম প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর তিনি তাঁর মনে পেয়েছিলেন। তাঁর কাব্য-লক্ষ্মী সেদিন সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন,

"* * * * Perfect thy human might,
Perfect the human race.

For thou art He, O King.
Only the night, is on thy soul.
By thy own will. Remove it and recover
The screne whole
Thou art indeed, then raise up
man the lover
To God the goal."

কারা-কক্ষের জনহীনতার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অন্তর-দেবতার কাছ থেকে শুনলেন সেই নির্দ্দেশ,...

Perfect thy human might
Perfect the human race...

কারাগার থেকে সূচনা হলো, মানব ইতিহাসের কঠিনতম সাধনা, জগতের ইতিহাসে সর্ব্বোত্তম মানবীয় পরীক্ষা...

আলীপুরের আদালতে এই রোমাঞ্চকর মামলার শুনানী যতই এগিয়ে চলতে লাগলো প্রধান আসামীর কাঠগড়ায় যে বন্দীটিকে দেখা যেতো, ততই তাঁর বাহ্যিক আচরণের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হতে লাগলো! ঘণ্টার পর ঘণ্টা আদালতে উকীলদের বিচার বিতর্ক চলেছে, তার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ কাঠগড়ায় বসে থাকেন, স্তিমিত-নেত্র ধ্যানস্থ। এই বিচার, এই আদালত, এই সওয়াল-জবাব, সমস্ত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন, যোগের প্রক্রিয়ায়।

তাঁর মামলার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর মনে আজ আর কোন অস্থিরতা নেই, তিনি তাঁর মনে স্থির জানেন এ থেকে তিনি মুক্ত হবেন।

কারাগারে পড়বার জন্যে বহু আবেদনের ফলে শ্রীঅরবিন্দ একখানি গ্রন্থ পেয়েছিলেন, গীতা…

ভারত-ইতিহাসের অন্যতম অদৃশ্য নায়করূপে এই মন্ত্রপূত গ্রন্থ বহুবার চলমান জীবনের ধারার ওপর তার রহস্যময় নিগূঢ় প্রভাব বিস্তার করেছে…আজ আবার লোকচক্ষুর অন্তরালে এই মহাগ্রন্থ শ্রীঅরবিন্দের মনে অক্ষরাতীত রহস্যলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিল। শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করলেন, দৃশ্যের অতীত অদৃশ্যের মহাবতরণ…বাসুদেবের আবির্ভাব। তাঁর সমস্ত সত্তা সে-আবির্ভাবের আলোকে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করলেন, জীবনাধীশ্বরের কাছে।

বাইরের জগৎ সে-সংবাদ তখন কিছুই জানতো না।

দীর্ঘ এক বৎসর শুনানীর পর, আসামীর পক্ষে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ বিচারক আর জুরীর ভদ্রমহোদয়দের সম্বোধন করে তাঁর ঐতিহাসিক অভিভাষণের শেষে বল্লেন, আপনাদের কাছে, আমার শেষ নিবেদন, আপনারা মনে করবেন না যে, আজ এই আদালতে এইখানে এই মামলার শেষ। স্মরণ রাখবেন, মানব-ইতিহাসের চির-উন্মুক্ত বিরাট বিচারালয়েও এই মাললার শুনানী চলছে। একদিন যখন এই মামলা সম্পর্কে আমাদের বিচারবিতর্ক একেবারে নীরব হয়ে যাবে, যখন আজকের দিনের এই আন্দোলন আর উত্তেজনার কোন চিহ্নই পড়ে থাকবে না…আজকে যিনি আসামী হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে যেদিন তিনি এই পৃথিবী থেকে চলেও যাবেন, তবুও সেই অনাগত পৃথিবীর লোক সেদিন শ্রীঅরবিন্দকেই একমাত্র স্মরণে রাখবে, দেশপ্রেমের কবি বলে, জাতীয়তার ঋষি বলে, মানবতার উপাসক বলে সমগ্র জগৎ তাঁকেই দেবে পুষ্পাঞ্জলী…আজকে যে বাণীর জন্যে তিনি অভিযুক্ত হচ্ছেন, সেদিন সে-বাণীর তরঙ্গ দেশ-দেশান্তরে মানবের অন্তরে অন্তরে মহাভাবের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে…

এই অমর ভবিষ্যৎ বাণী মহাকালের বুকে সঞ্চিত হয়ে রইলো।

বিচারক শ্রীঅরবিন্দকে মুক্তি দিলেন।

আজ সেই ঘটনার পর চল্লিশ বছর কেটে গিয়েছে।

সেই আলীপুরের আদালত কক্ষ...

আজ সেখানে পুষ্পমাল্য নিয়ে সমাগত হয়েছে স্বাধীন বাঙালী।

যে আদালতের কাঠগড়ায় একদিন শ্রীঅরবিন্দ আসামী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, আজ তার দেওয়ালে তার স্বদেশবাসীরা বিলম্বিত করে দেয় তাঁর আলেখ্য।

অপার শ্রদ্ধায় আর অপার বিস্ময়ে তাঁর প্রতিমূর্ত্তির দিকে চেয়ে আছে বাঙালী!

এই সর্ব্বরিক্ত ভাগ্যহত জাতির তুমিই একমাত্র অবশিষ্ট পুণ্যফল। হে ঋষি, কোন্ ভবিতব্যতার দিকে নিয়ে যাবে তোমার এই জন্মভূমিকে?

যে মহা-সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছিল, উনিশ শ' পাঁচ, কবে তা হবে সম্পূর্ণ সার্থক, সম্ভব?

তুমি ছাড়া এ প্রশ্নের উত্তর দেবে আর কে?

সমাপ্ত